বিবিধ সমালোচন।

(বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত)

৮০৮*

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কাঁটালপাড়া।
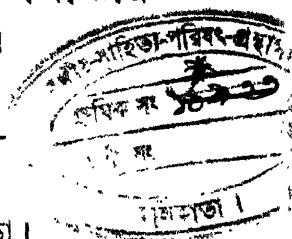
বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৭৬।
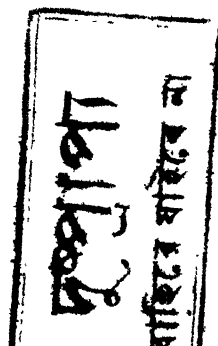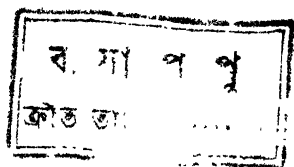
বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদর্শনে মৎপ্রণীত যে সকল গ্রন্থসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতকগুলি পরিত্যাগ করিয়াছি। যে কয়টি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত কবিলাম, তাহারও কিয়দংশ স্থানে২ পরিত্যাগ করিয়াছি। আধুনিক গ্রন্থের দোষগুণ বিচার প্রায়ই পরিত্যাগ করা গিয়াছে। যে যে স্থানে সাহিত্যবিষয়ক মূলকথার বিচার আছে, সেই সকল অংশই পুনর্মুদ্রিত করা গিয়াছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সূচিপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা
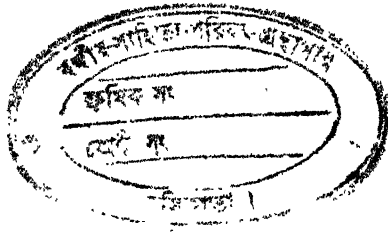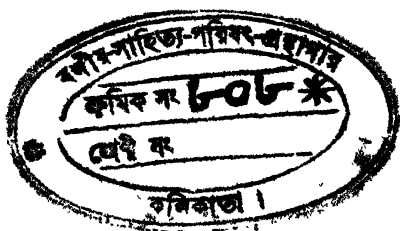
বিবিধ সমালোচন।

উত্তরচরিত।

ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি, এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্রুত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যেরূপ অনুরাগ, উত্তরচরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দ্দেশ বোধ হয়, অসঙ্গত হয় না।"

বাস্তবিক, যত কবি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভবভূতি তাহার মধ্যে একজন প্রধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল কবিদিগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে শকুন্তলার প্রণেতা ভিন্ন আর কেহই ভবভূতির সমকক্ষ হইতে পারেন না। পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণ মধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্ষপীয়র, এস্কিলস, সফো-

ক্লস্‌, কাল্‌দেরণ, এবং কালিদাস, ভবভূতি সে শ্রেণীভুক্ত নহেন বটে কিন্তু তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী।)

উত্তরচরিতের উপাখ্যান ভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহাতে রামকর্ত্তৃক সীতার প্রত্যাখ্যান ও সৎসঙ্গে পুনর্ম্মিলন বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল বৃত্তান্ত রামায়ণ হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু উপাখ্যান বর্ণন কার্য্যাদি সকল ভবভূতির স্বকপোলকল্পিত। রামায়ণে যেরূপ বাল্মীকির আশ্রমে সীতার বাস, এবং যেরূপ ঘটনায় পুনর্ম্মিলন, এবং মিলনান্তেই সীতার ভূতলপ্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, উত্তরচরিতে সে সকল সেরূপ বর্ণিত হয় নাই। উত্তরচরিতে সীতার রসাতলবাস, লবের যুদ্ধ এবং তদন্তে সীতার সহিত রামের পুনর্ম্মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ভিন্ন পন্থায় গমন করিয়া, ভবভূতি রসজ্ঞতার এবং আত্মশক্তিজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। কেন না যাহা একবার বাল্মীকিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, পৃথিবীর কোন কবি তাহা পুনর্ব্বর্ণন করিয়া প্রশংসাভাজন হইতে পারেন? ভবভূতি অথবা ভারতবর্ষীয় অন্য কোন কবি ঈদৃশ শক্তিমান্‌ নহেন যে, তদপেক্ষা সরসতা বিধান করিতে পারিতেন। যেমন ভবভূতি এই উত্তরচরিতের উপাখ্যান অন্য কবির গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি সেক্ষপীয়র তাঁহার রচিত প্রায় সকল নাটকেরই উপাখ্যান ভাগ অন্য গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ভবভূতির ন্যায় পূর্ব্ব কবিগণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করেন নাই। ইহারও বিশেষ কারণ আছে। সেক্ষপীয়র অদ্বিতীয় কবি। তিনি স্বীয় শক্তির পরিমাণ বিলক্ষণ বুঝিতেন —কোন মহাত্মা না বুঝেন? তিনি জানিতেন যে, যে সকল গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ হইতে তিনি আপন নাটকের উপাখ্যান ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেবল তাঁহার সঙ্গে কবিত্বশক্তিতে

সমকক্ষ নহেন। তিনি যে আকাশে আপন কবিত্বের প্রোজ্জ্বল কিরণমালা বিস্তার করিবেন, সেখানে পূর্ব্বগামীনক্ষত্রগণের কিরণ লোপ পাইবে। এজন্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই পূর্ব্বলেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তথাপি ইহাও বক্তব্য, যে কেবল একখানি নাটকের উপাখ্যান ভাগ তিনি হোমর হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই ট্রৈলস্ ও ক্রেসিদা নাটক প্রণয়ন কালে, ভবভূতি যেরূপ রামায়ণ হইতে ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন, তিনিও তেমনি ইলিয়দ হইতে ভিন্ন পথে গিয়াছেন।

ভবভূতিও সেক্ষপীয়রের ন্যায় আপন ক্ষমতার পরিমাণ জানিতেন। তিনি আপনাকে, সীতানির্ব্বাসন বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া, একখানি অত্যুৎকৃষ্ট নাটক প্রণয়নে সমর্থ বলিয়া, বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি ইহাও বুঝিতেন যে, কবিগুরু বাল্মীকির সহিত কদাচ তুলনাকাঙ্ক্ষী হইতে পারেন না। অতএব তিনি কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম * করিয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিতি করিয়াছেন। ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, অস্মদ্দেশীয় নাটকে মৃত্যুর প্রয়োগ নিষিদ্ধ † বলিয়া, ভবভূতি স্বীয় নাটকে সীতার পৃথিবী প্রবেশ বা তদ্বৎ শোকাবহ ব্যাপার বিন্যস্ত করিতে পারেন নাই।

উত্তরচরিতের চিত্রদর্শন নামে প্রথমাঙ্ক বঙ্গীয় পাঠক সমীপে বিলক্ষণ পরিচিত; কেন না শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই অঙ্ক অবলম্বন করিয়া,স্বপ্রণীত সীতার বনবাসের প্রথম অধ্যায় লিখিয়াছেন। এই চিত্রদর্শন কবিসুলভকৌশলময়। ইহাতে চিত্রদর্শনোপলক্ষে রামসীতার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

---

* ইদং গুরুভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যো নমোবাকং প্রশাস্মহে।
প্রস্তাবনা।

† দূরাহ্বানং বধো যুদ্ধং রাজ্যদেশাদিবিপ্লবঃ।
বিবাহো ভোজনং শাপোৎসর্গৌ মৃত্যুরতস্তথা॥
সাহিত্যদর্পণে।

ইহার উদ্দেশ্য এমত নহে যে কবি সংক্ষেপে পূর্ব্বঘটনা সকল বর্ণন করেন। রামসীতার অলৌকিক, অসীম, প্রগাঢ় প্রণয় বর্ণন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রণয়ের স্বরূপ অনুভব করিতে না পারিলে, সীতানির্ব্বাসন যে কি ভয়ানক ব্যাপার তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সীতার নির্ব্বাসন সামান্য স্ত্রী বিয়োগ নহে। স্ত্রীবিসর্জ্জন মাত্রই ক্লেশকর—মর্ম্মভেদী। যে কেহ আপন স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করে, তাহারই হৃদয়োচ্ছেদ হয়। যে বাল্যকালের ক্রীড়ার সঙ্গিনী, কৈশোরে জীবন সুখের প্রথম শিক্ষাদাত্রী, যৌবনে যে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, বার্দ্ধক্যে যে জীবনাবলম্বন—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারে? গৃহে যে দাসী, শয়নে যে অপ্সরা, বিপদে যে বন্ধু, রোগে যে বৈদ্য, কার্য্যে যে মন্ত্রী, ক্রীড়ায় যে সখী, বিদ্যায় যে শিষ্য, ধর্ম্মে যে গুরু;—ভাল বাসুক বা না বাসুক কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আশ্রমে যে আরাম, প্রবাসে যে চিন্তা,—স্বাস্থ্যে যে সুখ, রোগে যে ঔষধ,—অর্জ্জনে যে লক্ষ্মী, ব্যয়ে যে যশঃ—বিপদে যে বুদ্ধি, সম্পদে যে শোভা—ভাল বাসুক বা না বাসুক, কে সে স্ত্রীকে সহজে বিসর্জ্জন করিতে পারে? আর যে ভাল বাসে, পত্নী বিসর্জ্জন তাহার পক্ষে কি ভয়ানক দুর্ঘটনা! আবার যে রামের ন্যায় ভাল বাসে? যে পত্নীর স্পর্শমাত্রে অস্থিরচিত্ত,—জানে না যে,

———"সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা,
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শেস্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো,
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥"*

* "এক্ষণে আমি সুখভোগ করিতেছি, কি দুঃখভোগ করিতেছি; নিদ্রিত আছি, কি জাগরিত আছি; কিম্বা কোন বিষ প্রবাহ দেহে রক্তপ্রবাহের সহিত মিশ্রিত হইয়া, আমার এরূপ

যাহার পক্ষে—

"ম্লানস্য জীবকুসুমস্য বিকাশনানি,
সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ,
কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি ॥" †

যাহার বাহু সীতার চিরকালের উপাধান,—

আবিবাহ সময়াদ্‌গৃহে বনে,
শৈশবে তদনু যৌবনে পুনঃ।
স্বাপহেতু রনুপাশ্রিতোহন্যয়া,
রামবাহুরুপধানমেষ তে ॥"‡

যার পত্নী—

——"গেহে লক্ষ্মীরিয় মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োরসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহুলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ ॥"*

তাহার কি কষ্ট, কি সর্ব্বনাশ, কি জীবনসর্ব্বস্বধ্বংসাধিক

অবস্থা ঘটাইয়া দিয়াছে; অথবা মদ (মাদক দ্রব্য সেবন) জনিত মত্ততাবশতঃ এরূপ হইতেছে, ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।" নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ, ৩০ পৃষ্ঠা।

† "কমলনয়নে! তোমার এই বাক্যগুলি, শোকাদিসন্তপ্ত জীবনরূপ কুসুমের বিকাশক, ইন্দ্রিয়গণের মোহন ও সন্তর্পণ স্বরূপ, কর্ণের অমৃত স্বরূপ, এবং মনের গ্লানিপরিহারক (রসায়ন) ঔষধ স্বরূপ।" ঐ ৩১ পৃষ্ঠা।

‡ "রামবাহু বিবাহের সময় হইতে, কি গৃহ, কি বনে, সর্ব্বত্রই শৈশবাবস্থায় এবং পরে যৌবনাবস্থাতেও তোমার উপাধানের (মাথায় দিবার বালিসের) কার্য্য করিয়াছে।" ঐ-ঐ পৃষ্ঠা

* "ইনিই আমার গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপ, ইনিই আমার নয়নের অমৃত-শলাকাস্বরূপ, ইহারই এই স্পর্শ গাত্রলগ্ন চন্দনস্বরূপ সুখপ্রদ, এবং ইহারই এই বাহু আমার কণ্ঠস্থ শীতল এবং কোমল মুক্তাহার স্বরূপ।" ঐ—ঐ পৃষ্ঠা।

যন্ত্রণা! তৃতীয়াঙ্কে সেই যন্ত্রণার উপযুক্ত চিত্র প্রণয়নের উদ্যোগেই প্রথমাঙ্কে কবি এই প্রণয় চিত্রিত করিয়াছেন। এই প্রণয় সর্ব্ব প্রফুল্লকর মধ্যাহ্নসূর্য্য—সেই বিরহ যন্ত্রণা ইহার ভাবী করালকাদম্বিনী,—যদি সে মেঘের কালিমা অনুভব করিবে, তবে আগে এই সূর্য্যের প্রখরতা দেখ। যদি সেই অনন্ত বিস্তৃত অন্ধকারময় দুঃখসাগরের ভীষণ স্বরূপ অনুভব করিবে, তবে এই সুন্দর উপকূল,—প্রাসাদশ্রেণীসমুজ্জল, ফলপুষ্প পরিশোভিত বৃক্ষবাটিকা পরিমণ্ডিত, এই সর্ব্বসুখময় উপকূল দেখ। এই উপকূলেশ্বরী সীতাকে রামচন্দ্র নিদ্রিতাবস্থায় ঐ অতলস্পর্শী অন্ধকারসাগরে ডুবাইলেন।

আমরা সেই মনোমোহিনী কথার ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

অঙ্কমুখে, লক্ষ্মণ রাম সীতাকে একখানি চিত্র দেখাইতেছেন। জনকাদির বিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা গর্ভিণী সীতার বিনোদনার্থ এই চিত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাতে সীতার অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত রামসীতার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত চিত্রিত হইয়াছিল। এই "চিত্রদর্শন" কেবল প্রেমপরিপূর্ণ—স্নেহ যেন আর ধরে না। কথায়২ এই প্রেম। যখন অগ্নিশুদ্ধির কথা উল্লেখমাত্রে রাম, সীতাবমাননা ও সীতার পীড়ন জন্য আত্মতিরস্কার করিতেছিলেন—তখন সীতার কেবল "হোদু অজ্জউত্ত হোদু—এহি প্রেক্খন্ধ দাব দে চরিদং"—এই কথাঁতেই কত প্রেম! যখন মিথিলাবৃত্তান্তে সীতা রামের চিত্র দেখিলেন, তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিল! সীতা দেখিলেন,

"অম্মহে দলন্তনবনীলুপ্পলসামলসিনিদ্ধমসিণসোহমাণমংসলেণ দেহস্সোহগ্গেণ বিম্হঅথিমিদতাদদীসমাধসোম্মসুন্দরসিরী অনা-

দরক্খুড়িদসঙ্করসরাসণো সিহণ্ডমুগ্ধমুহমণ্ডলো অজ্জ-উত্তো আলি-হিদো।”*

যখন রাম সীতার বধূবেশ মনে করিয়া বলিলেন,

প্রতনুবিরলৈঃপ্রান্তোন্মীলন্মনোহর কুন্তলৈ
র্দশন মুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতীমুখম্।
ললিতললিতৈর্জ্যোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ-
রকৃতমধুরৈরম্বানাংমে কুতুহলমঙ্গকৈঃ।—†

যখন গোদাবরীতীর স্মরণ করিয়া কহিলেন,

কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ।
অশিথিলপরিরম্ভব্যাপৃতৈকৈকদোষ্ণো
রবিদিতগতযামা রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ॥*

---

* আহা! আর্য্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্লপ্রায় নব-নীলোৎপলবৎ শ্যামলস্নিগ্ধ কোমল শোভাবিশিষ্ট কি দেহ-সৌন্দর্য্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভাঙ্গিতেছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন! আহা কি সুন্দর!

† "মাতৃগণ তৎকালে বালা জানকীর অঙ্গ সৌষ্ঠবাদি দেখিয়া কি সুখীই হইয়াছিলেন, এবং ইনিও অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ও অনতি-নিবিড় দন্তগুলি, তাহার উভয়পার্শ্বস্থ মনোহর কুন্তল মনোহর মুখশ্রী, আর সুন্দর চন্দ্রকিরণ সদৃশ নির্ম্মল এবং কৃত্রিমবিলাস রহিত ক্ষুদ্র২ হস্ত পদাদি অঙ্গদ্বারা তাঁহাদিগের আনন্দের একশেষ করিয়াছিলেন।" নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ। এই কবিতাটি বালিকা বর্ণনার চূড়ান্ত।

* "একত্র শয়ন করিয়া পরস্পরের কপোলদেশ পরস্পরের কপোলের সহিত সংলগ্ন করিয়া এবং উভয়ে উভয়কে এক এক হস্ত দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া অনবরত মৃদুস্বরে ও যদৃচ্ছাক্রমে বহুবিধ গল্প করিতে২ অজ্ঞাতসারে রাত্রি অতিবাহিত করি-তাম।" ঐ
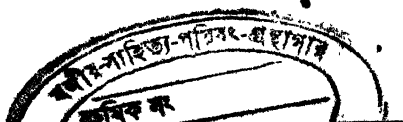
যখন যমুনাতটস্থ শ্যামবট স্মরণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন,

অলসলুলিতমুগ্ধান্যধ্বসঞ্জাতখেদা
দশিথিলপরিরম্ভৈর্দত্তসংবাহনানি।
পরিমৃদিতমৃণালীদুর্ব্বলান্যঙ্গকানি
ত্বমুরসি মম কৃত্বা যত্রনিদ্রামবাপ্তা॥†

যখন নিদ্রাভঙ্গান্তে রামকে দেখিতে না পাইয়া কৃত্রিম কোপে সীতা বলিলেন,—'

ভোদু মে কুবিস্সং জই মে পেক্খমাণা অত্তোণো পহবিস্সং। '‡

তখন কত প্রেম উছলিয়া উঠিতেছে! কিন্তু এই অতি বিচিত্র কবিত্বকৌশলময় চিত্রদর্শনে আরও কতই সুন্দর কথা আছে! লক্ষ্মণের সঙ্গে সীতার কৌতুক, "বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা?"—মিথিলা হইতে বিবাহ করিয়া আসিবার কথায় দশরথকে রামের স্মরণ—"স্মরামি! হন্ত স্মরামি!" মন্থরার কথায় রামের কথা অন্তরিত করণ ইত্যাদি। সুর্পনখার চিত্র দেখিয়া সীতার ভয় আমাদের অতি মিষ্ট লাগে,—

সীতা। হা অজ্জউত্ত এত্তিঅং দে দংসণং

রামঃ। অয়ি বিপ্রয়োগত্রস্তে! চিত্রমেতৎ।

সীতা। যধাতধা হোদু দুজ্জণো অসুহং উপ্পাদেই।*

---

† "যেখানে তুমি পথজনিত পরিশ্রমে ক্লান্তা হইয়া ঈষৎ কম্পবান্ তথাপি মনোহর এবং গাঢ় আলিঙ্গন কালে অত্যন্ত মর্দ্দনদায়ক আর দলিত মৃণালিনীর ন্যায় ম্লান ও দুর্ব্বল হস্তাদি অঙ্গ আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া নিদ্রা গমন করিয়াছিলে।" ঐ বাবুর অনুবাদ।

‡ হোক—আমি রাগ করিব—যদি তাঁহাকে দেখিয়া না ভুলিয়া যাই।

* সীতা। হা আর্য্যপুত্র, তোমার সঙ্গে এই দেখা।
রাম। বিরহের এত ভয়—এ যে চিত্র।
সীতা। যাহাই হউক না—দুর্জ্জন হলেই মন্দ ঘটায়।

স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে এটি অতি সুমিষ্ট ব্যঙ্গ; অথচ কেবল ব্যঙ্গ নহে।

কালিদাসের বর্ণনাশক্তি অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু ভবভূতির বর্ণনা-শক্তি তদপেক্ষা হীনা নহে—বরং অনেকাংশে তাঁহার প্রাধান্য আছে। কালিদাসের বর্ণনা, তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল; কিন্তু বর্ণনীয় বস্তু তাঁহার লেখনীমুখে স্বাভাবিক শোভার অধিক শোভা ধারণ করিয়া বসে। কালিদাস, একটী২ করিয়া বাছিয়া২ সুন্দর সামগ্রী গুলির একত্রিত করেন; সুন্দর সামগ্রী গুলির সঙ্গে তদীয় মধুর ক্রিয়া সকল ধ্বনিত করেন, তাহার উপর আবার উপমাচ্ছলে আরও কতকগুলিন সুন্দর সামগ্রী আনিয়া চাপাইয়া দেন। এজন্য তাঁহার কৃত বর্ণনা, যেমন স্বভাবের অবিকল অনুরূপ, তেমনি মাধুর্য্য পরিপূর্ণ হয়; বীভৎসাদি রসে কালিদাস সেই জন্য সফল হয়েন না। ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন, যে তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ঙ্কর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।

উপরে উত্তরচরিতের প্রথমাঙ্ক হইতে উদাহরণস্বরূপ কতক-গুলিন বর্ণনা উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা রামচন্দ্র ও জানকীর পরস্পরের বর্ণিত বরকন্যা রূপ। ভবভূতির বর্ণনাশক্তির বিশেষ পরিচয় দ্বিতীয় ও তৃতীয়াঙ্কে জনস্থান এবং পঞ্চবটী, এবং ষষ্ঠাঙ্কে

কুমারদিগের যুদ্ধ। প্রথমাঙ্ক হইতে আমরা একটী সংক্ষিপ্ত উদাহরণ উদ্ধৃত করি।

"বচ্ছএসো কুসমিদকঅম্বতরুতণ্ডবিদবরহিণো কিন্নামহেঅো গিরি, জত্থ, অনুভাবসোহগ্‌গমেত্তপরিসেসধূসরসিরী মুহুত্তং মুচ্ছন্তো তুএ পরুণ্ণেণ অবলম্বিদো তরুঅলে অজ্জউত্তো আলিহিদো। *

দুইটিমাত্র পদে কবি কত কথাই ব্যক্ত করিলেন! কি করুণরসচরমস্বরূপ চিত্র সৃজিত করিলেন!

চিত্র দর্শনান্তে সীতা নিদ্রা গেলেন। ইত্যবসরে দুর্ম্মুখ আসিয়া সীতাপবাদ সম্বাদ রামকে শুনাইল। রাম সীতাকে বিসর্জ্জন করিবার অভিপ্রায় করিলেন।

রামচন্দ্রের চরিত্র নির্দ্দোষ, অকলঙ্ক, দেবোপম বলিয়া ভারতে খ্যাত, এবং সেই জন্যই ভারতে তাঁহার দেবত্বে প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বস্তুতঃ বাল্মীকি কখন রামচন্দ্রকে নির্দ্দোষ বা সর্ব্বগুণবিভূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন নাই। রামায়ণগীত শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রের অনেক দোষ; কিন্তু সে সকল দোষ গুণাতিরেকমাত্র। এই জন্য তাঁহার দোষ গুলিনও মনোহর। কিন্তু গুণাতিরেকে যে সকল দোষ, তাহা মনোহর হইলেও দোষ বটে। পরশুরাম অতিরিক্ত পিতৃভক্ত বলিয়া মাতৃহন্তা, তাই বলিয়া কি মাতৃবধ দোষ নহে? পাণ্ডবেরা মাতৃ কথার অতিরিক্ত বশ বলিয়া এক পত্নীর পঞ্চ স্বামী, তাই বলিয়া কি অনেকের একপত্নীত্ব দোষ নয়?

---

* বৎস, এই যে পর্ব্বত, যদুপরে কুসুমিত কদম্বে ময়ূরেরা পুচ্ছ ধরিতেছে—উহার নাম কি? দেখিতেছি, তরুতলে আর্য্য পুত্র লিখিত—তাঁহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের পরিশেষমাত্র ধূষরশ্রীতে তাঁহাকে চেনা যাইতেছে। তিনি মুহুর্ম্মুহুঃ মূর্চ্ছা যাইতেছেন, —কাঁদিতেং তুমি তাঁহাকে ধরিয়া আছ।

রামচন্দ্রও অনেক নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াছেন।— যথা বালি-বধ। কিন্তু তিনি যে সকল অপরাধে অপরাধী, তন্মধ্যে এই সীতা বিসর্জ্জনাপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। শ্রীরামের চরিত্র কোন্ দোষে কলুষিত করিয়া কবি তাঁহাকে এই অপরাধে অপরাধী করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক।

যাঁহারা সাম্রাজ্য শাসনে ব্রতী হয়েন, প্রজারঞ্জন তাঁহাদিগের একটি মহদ্ধর্ম্ম! গ্রীক ও রোমক ইতিবৃত্তে ইহার অনেক উদাহরণ প্রকাশিত আছে। কিন্তু ইহার সীমাও আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে, ইহা দোষরূপে পরিণত হয়। যে রাজা প্রজার হিতার্থ আপনার অহিত করেন সে রাজার প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তি গুণ। ব্রুটস কৃত আত্ম পুত্রের বধ দণ্ডাজ্ঞা, এই গুণের উদাহরণ। যে রাজা প্রজার প্রিয় হইবার জন্য হিতাহিত সকল কার্য্যেই প্রবৃত্ত, সেই রাজাব প্রজারঞ্জনপ্রবৃত্তি দোষ। নাপোলেয়নদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি ইহার উদাহরণ। রোবস্পীয় ও দাঁতোকৃত বহু প্রজাবধ ইহার নিকৃষ্টতর উদাহবণ।

ভবভূতির রামচন্দ্র এই প্রজারঞ্জন প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সীতাকে বিসর্জ্জন করেন। অনেকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রজা-রঞ্জক ছিলেন। কিন্তু বামচন্দ্রের চরিত্রে স্বার্থপরতামাত্র ছিল না। সুতরাং তিনি স্বার্থ জন্য প্রজারঞ্জনে ব্রতী ছিলেন না। প্রজারঞ্জন রাজাদিগেব কর্ত্তব্য বলিয়াই, এবং ইক্ষাকু বংশীয়-দিগের কুলধর্ম্ম বলিয়াই তাহাতে তাঁহার এতদূর দার্ঢ্য। তিনি অষ্টাবক্রের সমক্ষে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন,

স্নেহং দয়াং তথাসৌখ্যং যদি বা জানকীমপি,
আরাধনায় লোকস্য, মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।†

---

† "প্রজারঞ্জনের অনুরোধে স্নেহ, দয়া, আত্মসুখ, কিম্বা জানকীকে বির্জ্জন করিতে হইলেও আমি কোনরূপ ক্লেশ বোধ করিব না।" নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

এবং দুর্ম্মুখের মুখে সীতার অপবাদ শুনিয়াও বলিলেন,

সতাং কেনাপিকার্য্যেণ লোকস্যারাধনম্ ব্রতং।
যৎ পূরিতং হি তাতেন মাঞ্চ প্রাণাংশ্চমুক্তা ॥‡

ভবভূতির রামচন্দ্র এই বিষম ভ্রমে ভ্রান্ত হইয়া কুলধর্ম্ম এবং রাজধর্ম্ম পালনার্থ, ভার্য্যাকে পবিত্রা জানিয়াও ত্যাগ করিলেন। রামায়ণের রামচন্দ্র সেরূপ নহেন। তিনিও জানিতেন যে সীতা পবিত্রা,—

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।

তিনি কেবল রাজকুলসুলভ অকীর্ত্তিশঙ্কা বশতঃ পবিত্রা পতিমাত্র জীবিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলেন। "আমি রাজা শ্রীরামচন্দ্র ইক্ষাকুবংশীয়, লোকে আমার মহিষীর অপবাদ করে! আমি এ অকীর্ত্তি সহিব না—যে স্ত্রীর লোকাপবাদ, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব।" এইরূপ রামায়ণের রামচন্দ্রের গর্ব্বিত চিত্তভাব।

বাস্তবিক সর্ব্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতি। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র, গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন যে উত্তরাকাণ্ড বাল্মীকি প্রণীত নহে। তাহা হইক বা হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তখন আর্য্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্য্য রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্য পরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন। ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃত হইয়াছিল।

‡ "লোকের আরাধনা করা সাধু ব্যক্তিদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই বিধেয়, এবং এইটি তাঁহাদের পক্ষে মহৎব্রতস্বরূপ। কারণ পিতা আমাকে এবং প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও তাহা প্রতিপালন করিয়াছিলেন।"—ঐ

ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য্য এবং ধৈর্য্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন২ কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। সীতার অপবাদ শুনিয়া, ভবভূতির রামচন্দ্র যে প্রকার বালিকাসুলভ বিলাপ করিলেন, তাহাই ইহার উদাহরণ স্থল। তিনি শুনিয়াই মূর্চ্ছিত হইলেন। তাহার পর দুর্ম্মুখের কাছে অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। অনেক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তন্মধ্যে অনেক সকরুণ কথা আছে বটে, কিন্তু এত বাগাড়ম্বরে করুণরসের একটু বিঘ্ন হয়। এত বালিকার মত কাঁদিলে রামচন্দ্রের প্রতি কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়। (নিম্নলিখিত উক্তি শুনিলে বা পাঠ করিলে, বোধ হয় যেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের কোন অধ্যাপক বা ছাত্রের রচনা—শব্দের বড় ঘটা, কিন্তু অন্তঃশূন্য—)

"হা দেবি দেবযজনসম্ভবে! হা স্বজন্মানুগ্রহপবিত্রিত-বসুন্ধরে! হা নিমিজনকবংশনন্দিনি! হা পাবকবশিষ্ঠারুন্ধতী প্রশস্তশীলশালিনি। হা রামময়জীবিতে! হা মহারণ্যবাসপ্রিয়-সখি! হা প্রিয়স্তোকবাদিনি! কথমেবংবিধায়াস্তবায়মীদৃশঃ পরিণামঃ!"*

(এইরূপ রচনা ভবভূতির ন্যায় মহাকবির অযোগ্য—কেবল আধুনিক বিদ্যালঙ্কারদিগের যোগ্য।) এইরূপস্থলে রামায়ণের রামচন্দ্র কি করিয়াছেন? কত কাঁদিয়াছেন? কিছুই না।

---

* হা দেবি যজ্ঞভূমিসম্ভবে! হা জন্মগ্রহণ পবিত্রিতবসুন্ধরে! হা নিমি এবং জনকবংশের আনন্দদাত্রি! হা অগ্নি বশিষ্টদেব এবং অরুন্ধতী সদৃশ প্রশংসনীয় চরিত্রে! হা রামময় জীবিতে! হা মহাবনবাসপ্রিয়সহচরি! হা মধুরভাষিণি! হা মিতবাদিনি! এইরূপ হইয়াও শেষে তোমার অদৃষ্টে এই ঘটিল।

নৃসিংহ বাবুর অনুবাদ।

মহাবীরপ্রকৃত শ্রীরাম সভামধ্যে সীতাপবাদের কথা শুনিলেন। শুনিয়া সভাসদ্‌গণকে কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সকলে কি এইরূপ বলে?" সকলে তাহাই বলিল। তখন ধীরপ্রকৃতি রাজা আর কাহাকে কিছু না বলিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। মূর্চ্ছাও গেলেন না,—মাতাও কুটিলেন না—ভূমেও গড়াগড়ি দিলেন না। পরে নিভৃত হইয়া, কাতরতাশূন্যা ভাষায় ভ্রাতৃবর্গকে ডাকাইলেন। ভ্রাতৃগণ আসিলে, পর্ব্বতবৎ অবিচলিত থাকিয়া, তাহাদিগকে আপন অভিপ্রায় জানাইলেন। বলিলেন, "আমি সীতাকে পবিত্রা জানি—সেই জন্যই গ্রহণ করিয়াছিলাম—কিন্তু এক্ষণে এই লোকাপবাদ! অতএব আমি সীতাকে ত্যাগ করিব।" স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া, লক্ষ্মণের প্রতি রাজাজ্ঞা প্রচার করিলেন, "তুমি সীতাকে বনে দিয়া আইস।" যেমন অন্যান্য নিত্যনৈমিত্তিক রাজকার্য্যে রাজানুচরকে রাজা নিযুক্ত করেন, সেইরূপ লক্ষ্মণকে সীতাবিসর্জ্জনে নিযুক্ত করিলেন। চক্ষে জল, কিন্তু একটিও শোকসূচক কথা ব্যবহার করিলেন না। "মর্ম্মাণি কৃন্তন্তি" ইত্যাদি বাক্য সীতাবিয়োগাশঙ্কায় নহে—অপবাদ সম্বন্ধে। তথাপি তাঁহার এই কয়টি কথায় কত দুঃখই আমরা অনুভূত করিতে পারি! এইস্থল উত্তরকাণ্ড হইতে উদ্ধৃত এবং অনুবাদিত করিলাম।

তস্যৈবং ভাষিতং শ্রুত্বা রাঘবঃ পরমার্ত্তবৎ।
উবাচ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ কথমেতদ্বদন্তি মাম্॥
সর্ব্বেতু শিরসাভূমাবভিবাদ্য প্রণম্য চ।
প্রত্যূচু রাঘবং দীনমেবমেতন্নসংশয়ঃ॥
শ্রুত্বাতুবাক্যংকাকুৎস্থঃ সর্ব্বেষাং সমুদীরিতম্।
বিসর্জ্জয়ামাস তদা বয়স্যান শত্রুসূদনঃ॥

বিসৃজ্য তু সুহৃদ্বর্গং বুদ্ধ্যানিশ্চিত্য রাঘবঃ।
সমীপে দ্বাস্থমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ॥
শীঘ্রমানয় সৌমিত্রিং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণং।
ভরতং চ মহাভাগং শত্রুঘ্নং চা পরাজিতং ॥

* * * *

তে তু দৃষ্ট্বা মুখং তস্য সগ্রহং শশিনং যথা।
সন্ধ্যাগতমিবাদিত্যং প্রভয়াপরিবর্জ্জিতং ॥
বাষ্পপূর্ণে চ নয়নে দৃষ্ট্বা রামস্য ধীমতঃ।
হৃতশোভং যথা পদ্ম মুখম্বীক্ষ্য চ তস্য তে ॥
ততোভিবাদ্য ত্বরিতাঃ পাদৌ রামস্য মূর্দ্ধভিঃ।
তস্থুঃ সমাহিতাঃ সর্ব্বে রামস্তশ্রুণ্যবর্ত্তয়ৎ ॥
তান্ পরিষ্বজ্য বাহুভ্যামুত্থাপ্য চ মহাবলঃ।
আসনেম্বাসতেত্যুক্ত্বা ততোবাক্যং জগাদ হ ॥
ভবন্তো মম সর্ব্বস্বং ভবন্তোজীবিতং মম।
ভবদ্ভিশ্চকৃতং রাজ্যং পালয়ামি নরেশ্বরাঃ ॥
ভবন্তঃকৃতশাস্ত্রার্থাবুদ্ধ্যাচ পরিনিষ্ঠিতাঃ।
সং ভূয়চ মদর্থোয় মন্বেষ্টব্যোনরেশ্বরাঃ ॥
তথা বদতি কাকুৎস্থে অবধানপরায়ণাঃ।
উদ্বিগ্নমনসঃ সর্ব্বে কিন্নু রাজাভিধাস্যতি ॥
তেষাং সমুপবিষ্টানাং সর্ব্বেষাং দীনচেতসাম্।
উবাচ বাক্যং কাকুৎস্থো মুখেন পরিশুষ্যতা ॥
সর্ব্বে শৃণুত ভদ্রম্বো মাকুরুধ্বং মনোন্যথা।
পৌরাণাং মম সীতায়া যাদৃশী বর্ত্ততে কথা ॥
পৌরাপবাদঃ সুমহান্ তথাজনপদস্যচ।
বর্ত্ততে ময়ি বীভৎসা মম মর্ম্মাণি কৃন্ততি ॥
অহং কিল কুলে জাত ইক্ষ্বাকুনাং মহাত্মনাম্।
সীতাপি সৎকুলে জাতা জনকানাং মহাত্মনাম্ ॥

* * * *

অন্তরাত্মা চ মে বেত্তি সীতাং শুদ্ধাং যশস্বিনীম্।
ততো গৃহীত্বা বৈদেহী মযোধ্যামহমাগতঃ ॥
অয়ং তু মে মহান্বাদঃ শোকশ্চ হৃদি বর্ত্ততে।
পৌরাপবাদঃ সুমহাংস্তথা জনপদস্যচ।

অকীর্ত্তির্যস্য গীয়েত লোকে ভূতস্য কস্যচিৎ ॥
পতত্যেবাধমাল্লোঁকান্ যাবচ্ছব্দ প্রকীর্ত্ত্যতে।
অকীর্ত্তির্নিন্দ্যতে দেবৈঃকীর্ত্তির্লোকেষু পূজ্যতে ॥
কীর্ত্ত্যর্থং তু সমারম্ভঃ সর্ব্বেষাং সুমহাত্মনাম্।
অথাহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্বা পুরুষর্ষভাঃ ॥
অপবাদভয়াদ্ভীতঃ কিং পুনর্জনকাত্মজাম্।
তস্মাদ্ভবন্তঃ পশ্যন্তু পতিতং শোকসাগরে ॥
নহি পশ্যাম্যহং ভূতে কিঞ্চিদ্দুঃখমতোধিকং।
স ত্বং প্রভাতে সৌমিত্রে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিতং রথং ॥
আরুহ্য সীতামারোপ্য বিষয়ান্তে সমুৎসৃজ।
গঙ্গায়াস্তপরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ ॥
আশ্রমোদিব্যসঙ্কাশ স্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈনাম্বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন ॥
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম।
নচাস্মিন প্রতিবক্তব্যং সীতাং প্রতি কথঞ্চন ॥
তস্মাত্ত্বং গচ্ছ সৌমিত্রে নাত্র কার্য্যবিচারণা।
অপ্রীতির্হি পরা মহ্যং ত্বয্যেতৎপ্রতিবারিতে ॥
শাপিতা হি ময়াযূয়ং পাদাভ্যাংজীবনেন চ।
যেষাং বাক্যান্তরে ব্রুয়ুরনুনেতুং কথঞ্চন ॥
অহিতানাম তে নিত্যংমদভিষ্ট বিঘাতনাৎ ॥
মানয়ন্তুভবন্তো মাং যদি মচ্ছাসনেস্থিতাঃ।
ইতোদ্য নীয়তাং সীতাং কুরুষ্ব বচনং মম ॥*

---

* অনুবাদ। তাহার এই মত কথা শুনিয়া রাম, পরম দুঃখিতের ন্যায় সুহৃৎ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, এইরূপ কি আমাকে বলে?" সকলে ভূমিতে মস্তক নত করিয়া অভিবাদন ও প্রণাম করিয়া, দুঃখিত রাঘবকে প্রত্যুত্তরে কহিল, "এইরূপই বটে—সংশয় নাই।" তখন শত্রুদমন রামচন্দ্র সকলের এই কথা শুনিয়া বয়স্যবর্গকে বিদায় দিলেন। বন্ধুবর্গকে বিদায় দিয়া, বুদ্ধির দ্বারা অবধারিত করিয়া সমীপে আসীন, দৌবারিককে এই কথা বলিলেন যে শুভলক্ষণ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে ও মহাভাগ ভরতকে ও অপরাজিত শত্রুঘ্নকে

এই রচনা অতি মনোমোহিনী। রামায়ণের রাম, ক্ষত্রিয়, মহোজ্জলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, জ্বলিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন।

শীঘ্র আন। * * * তাঁহারা রামের মুখ, রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় এবং সন্ধ্যাকালীন আদিত্যের ন্যায় প্রভাহীন দেখিলেন। ধীমান্ রামচন্দ্রের্ নয়নযুগল বাষ্পপূর্ণ এবং মুখ হতশোভ পদ্মের ন্যায় দেখিলেন। তাঁহারা ত্বরিত তাঁহার অভিবাদন করিয়া এবং তাঁহার পদযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া সকলে সমাহিত হইয়া রহিলেন। রাম অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পরে বাহুযুগলের দ্বারা তাহাদিগকে আলিঙ্গন ও উত্থাপন পূর্ব্বক মহাবল রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে "আসনে উপবেশন কর:" এই বলিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে নরেশ্বরগণ! আমার সর্ব্বস্ব তোমরা; তোমরা আমার জীবন; তোমাদিগের কৃত রাজ্য আমি পালন করি। তোমরা শাস্ত্রার্থ অবগত; এবং তোমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করিয়াছ। হে নরেশ্বরগণ, তোমরা মিলিত হইয়া, যাহা বলি তাহার অর্থানুসন্ধান কর।" রামচন্দ্র এই কথা বলিলে অবধানপরায়ণ ভ্রাতৃগণ, "রাজা কি বলেন" ইহা ভাবিয়া উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রহিলেন।

তখন সেই দীনচেতা উপবিষ্ট ভ্রাতৃগণকে পরিশুষ্কমুখে রামচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল হউক! আমার সীতার সম্বন্ধে পৌরজনমধ্যে যেরূপ কথা বর্ত্তিয়াছে, তাহা শুন—মন অন্যথা করিও না। জনপদে এবং পৌরজন মধ্যে আমার সুমহান্ অপবাদরূপ বীভৎস কথা রটিয়াছে, আমার তাহাতে মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে। আমি মহাত্মা ইক্ষাকুদিগের কুলে জন্মিয়াছি, সীতাও মহাত্মা জনকরাজার সৎকুলে জন্মিয়াছেন। আমার অন্তরাত্মাও জানে যে, যশস্বিনী সীতা শুদ্ধচরিত্রা।

* * * *

তখন আমি বৈদেহীকে গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় আসিলাম। এক্ষণে এই মহান অপবাদে আমার হৃদয়ে শোক বর্ত্তিতেছে। পৌরজন মধ্যে এবং জনপদে সুমহান্ অপবাদ হইয়াছে।

ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার ক্রন্দনের কিয়দংশ পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। রামায়ণের সঙ্গে তুলনা করিবার জন্য অবশিষ্টাংশও উদ্ধৃত করিলাম।

রাম। হা কষ্টমতিবীভৎসকর্ম্মা নৃশংসোস্মি সংবৃত্তঃ
শৈশবাৎ প্রভৃতি পোষিতাং প্রিয়াং
সৌহৃদাদপৃথগাশয়ামিমাম্।

লোকে যাহার অকীর্ত্তিগান করে যাবৎ সেই অকীর্ত্তি লোকে প্রকীর্ত্তিত হইবে তাবৎ সে অধমলোকে পতিত থাকিবে। দেবতারা অকীর্ত্তির নিন্দা করেন, এবং কীর্ত্তিই সকল লোকে পূজনীয়া। সকল মহাত্মা ব্যক্তিদের যত্ন কীর্ত্তিরই জন্য। হে পুরুষর্ষভগণ, আমি অপবাদভয়ে ভীত হইয়া জীবন ত্যাগ করিতে পারি তোমাদিগের ত্যাগ করিতে পারি, সীতার ত কথাই নাই।

অতএব তোমরা দেখ আমি কি শোকসাগরে পতিত হইয়াছি! আমি ইহার অধিক দুঃখ জগতে আর দেখি না। অতএব হে সৌমিত্রে! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রাধিষ্ঠিত রথে সীতাকে আরোপণ করিয়া স্বয়ং আরোহণ করিয়া, তাঁহাকে দেশান্তরে ত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার অপর পারে তমসা নদীরতীরে মহাত্মা বাল্মীকি মুনির স্বর্গতুল্য আশ্রম। হে রঘুনন্দন! সেই বিজনদেশে তুমি ইহাকে ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আইস,—আমার বচন রক্ষা কর—সীতাপরিত্যাগ বিষয়ে তুমি ইহার প্রতিবাদ কিছুই করিও না। অতএব হে সৌমিত্রে! যাও—এবিষয়ে আর কিছু বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যদি ইহার বারণ কর, তবে আমার পরমাপ্রীতিকর হইবে। আমি চরণের স্পর্শে এবং জীবনের দ্বারা তোমাদিগকে শপথ করাইতেছি—যে যে ইহাতে আমাকে অনুনয় করিবার জন্য কোনরূপ কোন কথা বলিবে, আমার অভীষ্টহানি হেতুক তাহার শত্রু খ্যাতি নিত্য বর্ত্তিবে। যদি আমার আজ্ঞাবহ থাকিয়া, তোমরা আমাকে সম্মান করিতে চাও, তোমরা তবে আমার বচন রক্ষা কর, অদ্য সীতাকে লইয়া যাও।

ছদ্মনা পরিদদামি মৃত্যবে
সৌনিকো গৃহশকুন্তিকামিব ॥
তৎকিমস্পর্শনীয়ঃ পাতকী দেবীং দূষযামি।
[সীতায়াঃ শিরঃ স্বৈরমুন্নময্য বাহুমাকর্ষন্]
অপূর্ব্বকর্ম্মচাণ্ডাল ময়ি মুগ্ধে বিমুঞ্চমাম্।
শ্রিতাসি চন্দনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্।

উত্থায়। হন্ত বিপর্য্যস্তঃ সম্প্রতি জীবলোকঃ পর্য্যবসিতং জীবিতপ্রয়োজনং রামস্য শূন্যমধুনা জীর্ণারণ্যং জগৎ অসারঃ সংসারঃ কষ্টপ্রায়ং শরীরম্ অশরণোস্মি কিংকরোমি কা গতিঃ। অথবা।

দুঃখসংবেদনায়ৈব রামে চৈতন্যমাহিতম্।
মর্ম্মোপঘাতিভিঃ প্রাণৈ র্বজ্রকীলায়িতংস্থিরৈঃ॥

হা অম্ব অরুন্ধতি হা ভগবন্তৌ বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রৌ হা ভগবন্ পাবক হা দেবি ভূতধাত্রি হা তাত জনক হা তাত হা মাতরঃ হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাধিপতে বিভীষণ হা প্রিয়সখ সুগ্রীব হা সৌম্য হনুমন্ হা সখি ত্রিজটে মুষিতাস্থ পরিভূতাস্থ রামহতকেন। অথবা কশ্চতেষামহমিদানীমাহ্বানে।

তেহি মন্যে মহাত্মানঃ কৃতঘ্নেন দুরাত্মনা।
ময়াগৃহীতনামানঃ স্পৃশ্যন্ত ইব পাপ্মনা॥

যোহম্।

বিস্রম্ভাদুরসি নিপত্য লব্ধনিদ্রা
মুন্মুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্য শোভাম॥
আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগর্ভগুর্ব্বীং
ক্রব্যাদ্ভ্যো বলিমিব নির্ঘৃণঃ ক্ষিপামি॥
সীতায়াঃ পাদৌ শিরসি কৃত্বা। দেবি দেবি অয়ং
পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসা পাদপঙ্কজস্পর্শঃ

ইতি রোদিতি।*

---

* হায় কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের মত, কি ঘৃণাজনক কর্ম্মই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি! বাল্যাবস্থা হইতে যাঁহাকে প্রিয়তমা বলিয়া প্রতিপালিত করিয়াছি; যিনি গাঢ় প্রণয় বশতঃ কোন রূপেই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বোধ করেন না, আজি আমি

ইহার অনেকগুলিন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্য্য-বীর্য্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া,

---

সেই প্রিয়াকে মাংস বিক্রয়ী যেমন গৃহপালিতা পক্ষিণীকে অনায়াসে বধ করে, সেইরূপ ছল ক্রমে করাল কাল গ্রাসে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব পাতকী সুতরাং অস্পৃশ্য আমি দেবীকে আর কেন কলঙ্কিত করি? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক আপনার বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে! এ অভাগ্যকে পরিত্যাগ কর। আমি অদৃষ্টচর এবং অশ্রুতপূর্ব্ব পাপ কর্ম্ম করিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি! হায়! তুমি চন্দনবৃক্ষভ্রমে এই ভয়ানক বিষবৃক্ষকে (কি কুক্ষণেই) আশ্রয় করিয়াছিলে? (উঠিয়া) হায় এক্ষণে জীবলোক উচ্ছিন্ন হইল। রামেরও আর জীবিত থাকিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পৃথিবী শূন্য এবং জীর্ণ অরণ্য সদৃশ নীরস বোধ হইতেছে। সংসার অসার হইয়াছে। জীবন কেবলমাত্র ক্লেশের নিদানস্বরূপ বোধ হইতেছে। হায়! এতদিনে আশ্রয়বিহীন হইলাম। এখন কি করি (কোথায় যাই) কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। (চিন্তা করিয়া) উঃ! আমার এখন কি গতি হইবে? অথবা (সে চিন্তায় আর কি হইবে?) যাবজ্জীবন দুঃখভোগ করিবার নিমিত্তই (হতভাগ্য) রামের দেহে প্রাণবায়ুর সঞ্চার হইয়াছিল, নতুবা নিজ জীবন পর্য্যন্তেও কেন বজ্রের ন্যায় মর্ম্মভেদ করিতে থাকিবে? হা মাতঃ অরুন্ধতি! হা ভগবন্ বশিষ্ঠদেব! হা মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র হা ভগবন্ অগ্নে! হা নিখিল ভূত ধাত্রি ভগবতি বসুন্ধরে! হা তাত জনক! হা পিতঃ (দশরথ!) হা কৌশল্যা প্রভৃতি মাতৃগণ! হা পরমোপকারিন্ লঙ্কাপতি বিভীষণ! হা প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব! হা সৌম্য হনুমন্! হা সখি ত্রিজটে! আজি হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদিগের সর্ব্বনাশ (সর্ব্বস্বাপহরণ) এবং অবমাননা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। (চিন্তা করিয়া) অথবা এই হতভাগ্য এখন তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিবারও উপযুক্ত নহে। কারণ, এই পাপাত্মা কৃতঘ্ন পামর কেবলমাত্র সেই সকল মহাত্মাদিগের নাম গ্রহণ করিলেও তাঁহারা পাপস্পৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যেহেতুক আমি দৃঢ়বিশ্বাস বশতঃ বক্ষঃস্থলে নিদ্রিতা প্রেয়সীকে স্বপ্নাবস্থায়

আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন উঠে নাই। তিনি সীতার বনবাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠকালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালির মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে বটে।

ভবভূতির পক্ষে ইহা বক্তব্য, যে উত্তর চরিত নাটক; নাটকের উদ্দেশ্য হৃচ্চিত্র; রামায়ণ প্রভৃতি উপাখ্যান, কাব্যের + উদ্দেশ্য ভিন্নপ্রকার। সে উদ্দেশ্য কার্য্যপরম্পরার সরস বিবৃতি। কে কি করিল, তাহাই উপাখ্যান কাব্যে লেখকেরা প্রতীয়মান করিতে চাহেন; সে সকল কার্য্য করিবার সময়ে কে কি ভাবিল, তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার প্রয়োজন তাদৃশ বলবৎ নহে। কিন্তু নাটকে সেই প্রয়োজনই বলবৎ। নাটককারের নিকট আমরা নায়কের হৃদয়ের প্রকৃত চিত্র চাহি। সুতরাং তাঁহাকে চিত্তভাব অধিকতর স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। অনেক বাগাড়ম্বর আবশ্যক হয়। কিন্তু তথাপি উত্তর চরিতের প্রথমাঙ্কের রামবিলাপ মনোহর নহে। সে কথা গুলিন বীরবাক্য নহে—নবপ্রেমমুগ্ধ অসারবান্ যুবকের কথা।

উদ্বেগ বশতঃ ঈষৎ কম্পিত গর্ভভরে মন্থরা দেখিয়াও অনায়াসেই উন্মোচন পূর্ব্বক নির্দ্দয় হৃদয়ে মাংসাশী রাক্ষসদিগকে উপহারের ন্যায় নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছি। (সীতার চরণদ্বয় মস্তকদ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক) দেবি! দেবি! রামের দ্বারা তোমার পদপঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হইল! (এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।)

+ আলঙ্কারিকেরা রামায়ণকে কাব্য বলেন না—ইতিহাস বলেন।

প্রথমাঙ্ক ও দ্বিতীয়াঙ্কের মধ্যে দ্বাদশবৎসর কাল ব্যবধান। উত্তরচরিতের একটী দোষ এই যে, নাটকবর্ণিত ক্রিয়া সকলের পরস্পর কালগত নৈকট্য নাই। এ সম্বন্ধে উইণ্টর্সটেল নামক সেক্ষপীয়রকৃত বিখ্যাত নাটকের সঙ্গে ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

এই দ্বাদশবৎসর মধ্যে সীতা যমল সন্তান প্রসব করিয়া স্বয়ং পাতালে অবস্থান করিলেন, তাঁহার পুত্রেরা বাল্মীকির আশ্রমে প্রতিপালিত এবং সুশিক্ষিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্রের পূর্ব্বপ্রদত্ত বরে দিব্যাস্ত্র তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ হইল। এদিকে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু সৈন্য লইয়া যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে প্রেরিত হইলেন। কোন দিন রামচন্দ্র দৈবাদেশে জানিলেন যে শম্বূক নামক কোন নীচজাতীয় ব্যক্তি তাঁহার রাজ্যমধ্যে তপশ্চারণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অকাল মৃত্যু উপস্থিত হইতেছে। রামচন্দ্র ঐ শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদ মানসে সশস্ত্রে তাহার অনুসন্ধানে নানা দেশ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শম্বূক পঞ্চবটীর বনে তপঃ করিতেছিল।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে মুনিপত্নী আত্রেয়ী এবং বনদেবতা বাসন্তীর প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ হইয়াছে। যেমন প্রথমাঙ্কের পূর্ব্বে প্রস্তাবনা, সেইরূপ অন্যান্য অঙ্কের পূর্ব্বে একটি২ বিষ্কম্ভক আছে। এগুলি অতি মনোহর। কখন বিদুষী ঋষিপত্নী, কখন প্রেমময়ী বনদেবী, কখন তমসা মুরলা নদী, কখন বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, এইরূপে সৌন্দর্য্যময়ী সৃষ্টির দ্বারা ভবভূতি বিষ্কম্ভক সকল অতি রমণীয় করিয়াছেন। দ্বিতীয়াঙ্কের আরম্ভই সুন্দর। যথা;—

"অধ্বগবেশা তাপসী। অয়ে বন দেবতেয়ং ফলকুসুমপল্ল-বার্ঘেণ মামুপতিষ্ঠতে।(১)

শিক্ষা সম্বন্ধে আত্রেয়ীর কথা বড় সুন্দর—

"বিতরতি গুরুঃপ্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈবতথা জড়ে নচখলু
তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তিচ।
ভবতি চ তয়োর্ভূয়ান্ ভেদঃফলংপ্রতি তদ্‌যথা প্রভবতি
শুচির্বিম্বোদ্‌গ্রাহে মণির্ন মৃদাং চয়ঃ॥(১)

হরেস্ হেমান উইলসন্ বলেন যে, উত্তরচরিতে কতকগুলি এমত সুন্দর ভাব আছে যে তদপেক্ষা সুন্দর ভাব কোন ভাষা-তেই নাই। উপরে উদ্ধৃত কবিতা এই কথার উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

রামচন্দ্র শম্বূকের সন্ধান করিতে২ পঞ্চবটীর বনে শম্বূককে পাইলেন। এবং খড়্গাদ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। শম্বূক দিব্য পুরুষ; রামের প্রহারে শাপমুক্ত হইয়া রামকে প্রণিপাত করিল। এবং জনস্থানাদি রামচন্দ্রের পূর্ব্বপরিচিত স্থান সকল দেখাইতে লাগিল। উভয়ের কথোপকথনে বনবর্ণনা অতি মনোহর।

স্নিগ্ধশ্যামাঃক্বচিদপরতো ভীষণাভোগরূক্ষাঃ
স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৃতৈর্নির্ঝরাণাম্।
এতে তীর্থাশ্রমগিরিসরিদ্গর্ত্তকান্তারমিশ্রাঃ
সন্দৃশ্যন্তে পরিচিতভুবো দণ্ডকারণ্যভাগাঃ॥

---

(১) অহো! এই বনদেবতা ফলপুষ্প পল্লবার্ঘের দ্বারা আমার অভ্যর্থনা করিতেছেন।

(১) গুরু বুদ্ধিমান্‌কে যেমন শিক্ষা দেন, জড়কেও তদ্রূপ দিয়া থাকেন। কাহারও জ্ঞানের বিশেষ সাহায্য বা ক্ষতি করেন না। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে ফলের তারতম্য ঘটে। কেবল নির্ম্মল মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে; মৃত্তিকা তাহা পারে না।

*　　*　　*　　*

এতানি খলু সর্ব্বভূতলোমহর্ষণানি উন্মত্তচণ্ড
শ্বাপদকুলসঙ্কুলগিরিগহ্বরাণি জনস্থানপর্য্যন্ত-
দীর্ঘারণ্যানি দক্ষিণাং দিশমভিবর্ত্তন্তে।

তথাহি

নিষ্কূজস্তিমিতাঃ ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রোচ্চণ্ডসত্ত্বস্বনাঃ
স্বেচ্ছাসুপ্তগভীরঘোষভুজগশ্বাস প্রদীপ্তাগ্নয়ঃ।
সীমানঃপ্রদরোদরেষু বিলসৎস্বল্পাম্ভসো যাস্বয়ং
তৃষ্যদ্ভিঃ প্রতিসূর্য্যকৈরজগরস্বেদদ্রবঃ পীয়তে॥

*　　*　　*　　*

অথৈতানি মদকলময়ূরকণ্ঠকোমলচ্ছবিভিরবকীর্ণানি
পর্ব্বতৈরবিরলনিবিষ্টনীলবহুলচ্ছায়তরুষণ্ডমণ্ডিতানি
অসম্ভ্রান্ত বিবিধ মৃগ যূথানি
পশ্যতু মহানুভাবঃ প্রশান্তগম্ভীরাণি মধ্যমারণ্যকানি।

ইহ সমদশকুন্তাক্রান্তবানীরবীরুৎ
প্রসবসুরভিশীতস্বচ্ছতোয়াঃ বহন্তি।
ফলভরপরিণামশ্যামজম্বূনিকুঞ্জ
স্খলনমুখরভূরিস্রোতসো নির্ঝরিণ্যঃ॥

অপিচ

দধতি কুহরভাজামত্র ভল্লূকযূনা
মনুরসিতগুরূণি স্ত্যানমম্বূকৃতানি।
শিশিরকটুকষায়ঃ স্ত্যায়তে শল্লকীনা
মিভদলিতবিকীর্ণগ্রন্থিনিষ্যন্দগন্ধঃ। (২)

---

(২) এই যে পরিচিতভূমি দণ্ডকারণ্য ভাগ দেখা যাইতেছে। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভয়ঙ্কর রুক্ষদৃশ্য, কোথাও বা নির্ঝরগণের ঝরঝরশব্দে দিক্ সকল শব্দিত হইতেছে; কোথাও পুণ্যতীর্থ, কোথাও মুনিগণের আশ্রমপদ, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী এবং মধ্যে২ অরণ্য।

ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘ অরণ্য সকল দক্ষিণদিগে চলি-তেছে। এ সকল সর্ব্বলোক লোমহর্ষণ—অভ্রস্থ গিরিগহ্বর উন্মত্ত প্রচণ্ড হিংস্র পশুগণে সমাকুল। কোথাও বা একবারে

প্রবন্ধের অসহ্য দৈর্ঘ্যাশঙ্কায় আর অধিক উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

শম্বুক বিদায় পরে পুনরাগমন পূর্ব্বক রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামাগমন শুনিয়া তাঁহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিতেছেন। শুনিয়া রাম তথায় চলিলেন। গমনকালীন ক্রৌঞ্চাবত পর্ব্বতাদির বর্ণনা অতি মনোহর। আমরা সচরাচর অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রশংসা করি না, কিন্তু এরূপ অনুপ্রাসের উপর বিরক্ত হওয়াও যায় না।

গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎ কীচক
স্তম্বাড়ম্বর মূকমৌকুলিকুলঃক্রৌঞ্চাবতোয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥

নিঃশব্দ; কোথাও পশুদিগের প্রচণ্ড গর্জ্জন পরিপূর্ণ; কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীর গর্জ্জনকারী ভুজঙ্গের নিশ্বাসে অগ্নি প্রজ্বলিত। কোথাও গর্ত্তে অল্প জল দেখা যাইতেছে। তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের ঘর্ম্মবিন্দু পান করিতেছে।

* * * দেখুন, এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মদকল ময়ূরের কণ্ঠের ন্যায় কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ; ঘননিবিষ্ট, নীলপ্রধান কান্তি, অনতিপ্রৌঢ় বৃক্ষ সমূহে শোভিত; এবং ভয়শূন্য বিবিধ মৃগযূথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী সকল বহুস্রোতে বহিতেছে, আনন্দিত পক্ষী সকল তত্রস্থ বেতসলতার উপর বসিতেছে, তাহাতে বেতসের কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া সেই জলে পড়িয়া জলকে সুগন্ধি এবং সুশীতল করিতেছে; স্রোতঃ পরিপক্বফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্খলিত হওয়াতে শব্দিত হইতেছে। গিরিবিবরবাসী যুবা ভল্লুকদিগের থুৎকার শব্দ প্রতিধ্বনিতে গম্ভীর হইতেছে। এবং গজগণের দ্বারা ভগ্ন শল্লকী বৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থি হইতে শীতল কটু, কষায় সুগন্ধ বাহির হইতেছে।

এতেতে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ।(১)

তৃতীয়াঙ্ক অতি মনোহর। সত্য বটে যে, এই উৎকৃষ্ট নাটকে ক্রিয়াপারম্পর্য্য বড় মনোহর নহে, এবং তৃতীয়াঙ্ক সেই দোষে বিশেষ দুষ্ট। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম অঙ্ক যেরূপ বিস্তৃত, তদনুরূপ বহুল ক্রিয়াপরম্পরা নায়ক নায়িকাগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয় নাই। যিনি মাক্‌বেথ পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানেন যে নাটকে বর্ণিতা ক্রিয়া সকলের বাহুল্য, পারম্পর্য্য, এবং শীঘ্র সম্পাদন, কি প্রকার চিত্তকে মন্ত্রমুগ্ধ করে। কার্য্যগত এই গুণ নাটকের একটি প্রধান গুণ। উত্তরচরিতে তাহার বিরলপ্রচার; বিশেষতঃ প্রথম ও তৃতীয়াঙ্কে। তথাপি ইহাতে কবি যে অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই গুণে আমরা সে সকল দোষ বিস্মৃত হই।

দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক যেমন মধুর, তৃতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভক ততোধিক। গোদাবরীসংমিলিতা, তমসা ও মুরলা নাম্নী দুইটি নদী রূপ ধারণ করিয়া রামসীতা বিষয়িণী কথা কহিতেছে।

অদ্য দ্বাদশ বৎসর হইল, রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন

(১) এই পর্ব্বত ক্রৌঞ্চাবত। এখানে অব্যক্তনাদীকুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকার শব্দিত বায়ুযোগ ধ্বনিত বংশবিশেষের গুচ্ছে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দে আছে। এবং ইহাতে সর্পেরা, চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া পুরাতন বটবৃক্ষের স্কন্ধে লুকাইয়া আছে। আর এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত। পর্ব্বত কুহরে গোদাবরী বারিরাশি গদ্গদনিনাদ করিতেছে; শিরোদেশ মেঘ মালায় অলঙ্কৃত হইয়া নীল শোভা ধারণ করিয়াছে; আর এই গভীরজলশালিনী পবিত্রা নদীগণের সঙ্গম পরস্পরের প্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া রহিয়াছে।

করিয়াছেন। প্রথম বিরহে তাঁহার যে গুরুতর শোক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালসহকারে সে শোকের লাঘব জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই; সর্ব্বসন্তাপহর্ত্তা কাল এই সন্তাপের শমতা সাধিতে পারে নাই।

অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণোরসঃ।(১)

এইরূপ মর্ম্ম মধ্যে রুদ্ধ সন্তাপে দগ্ধ হইয়া রাম, পরিক্ষীণ শরীরে রাজকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন। রাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে, সে কষ্টের তাদৃশ বাহ্য প্রকাশ পায় না; কিন্তু আজ পঞ্চবটীতে আসিয়া রামের ধৈর্য্যাবলম্বনের সে উপায়ও নাই! এ আবার সেই জনস্থান; পদে২ সীতাসহবাসের চিহ্নপরিপূর্ণ। এই জনস্থানে কতকাল, কত সুখে, সীতার সহিত বাস করিয়াছিলেন, তাহা পদে২ মনে পড়িতেছে। রামের সেই দ্বাদশ বৎসরের রুদ্ধ শোক প্রবাহ ছুটিয়াছে—সে প্রবাহবলে, এই গোদাবরী স্রোতঃস্খলিত শিলাচয়ের ন্যায় রামের হৃদয়পাষাণ আজি কোথায় যাইবে, কে বলিতে পারে?

জনস্থানবাহিনী করুণাদ্রাবিতা নদীগুলিন দেখিল যে আজি বড় বিপদ। তখন মুরলা কলকল করিয়া গোদাবরীকে বলিতে চলিল, "ভগবতি! সাবধান থাকিও—আজ রামের বড় বিপদ। দেখিও রাম যদি মূর্চ্ছা যান, তবে তোমার জলকণাপূর্ণ শীতল তরঙ্গের বাতাসে মৃদু২ তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিও।" রঘুকুলদেবতা ভাগীরথী এই শোকতপনাতপসন্তাপ হইতে রামকে রক্ষা করিবার জন্য এক সর্ব্বসন্তাপসংহারিণী ছায়াকে জনস্থানে

(১) অবিচলিত গভীরত্ব হেতুক হৃদয় মধ্যে রুদ্ধ, এজন্য গাঢ়ব্যথ রামের সন্তাপ মুখবদ্ধ পাত্র মধ্যে পাকের সন্তাপের ন্যায় বাহিরে প্রকাশ পায় না।

পাঠাইলেন। সেই ছায়ার স্নিগ্ধতায় অদ্যাপি ভারতবর্ষ মুগ্ধ রহিয়াছে। সেই ছায়া হইতে কবি এই তৃতীয়াঙ্কের নাম রাখিয়াছিলেন "ছায়া।"—এই ছায়া, সেই বহুকালবিস্মৃতা, পাতাল প্রবিষ্টা, শীর্ণ দেহমাত্রবিশিষ্টা হতভাগিনী রামমনোমোহিনী সীতার ছায়া।

সীতা লবকুশকে প্রসব করিলে পর, ভাগীরথী এবং পৃথিবী বালক দুইটিকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়া রাখিয়াছিলেন। অদ্য কুশলবের জন্মতিথি—সীতাকে স্বহস্তাবচিত কুসুমাঞ্জলি দিয়া পতিকুলাদিপুরুষ সূর্য্যদেবের পূজা করিতে ভাগীরথী এই জনস্থানে পাঠাইলেন। এবং আপন দৈবশক্তিপ্রভাবে রঘুকুলবধূকে অদর্শনীয়া করিলেন। ছায়ারূপিণী সীতা সকলকে দেখিতে পাইতেছিলেন। সীতাকে কেহ দেখিতে পাইতেছিল না।

সীতা তখন জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। সীতাও আসিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি কিরূপ? তাঁহার মুখ "পরিপাণ্ডুদুর্ব্বল কপোলসুন্দর"—কবরী বিলোল—শারদাতপসন্তপ্ত কেতকী কুসুমান্তর্গত পত্রের ন্যায়, বন্ধনবিচ্যুত কিসলয়ের মত, সীতা সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। জনস্থানে তাঁহার গভীর প্রেম! পূর্ব্বসুখের স্থান দেখিয়া বিস্মৃতি জন্মিল—আবার সেই দিন মনে পড়িল। যখন সীতা রামসহবাসে এই বনে থাকিতেন, তখন জনস্থান বনদেবতা বাসন্তীর সহিত তাঁহার সখীত্ব হইয়াছিল। তখন সীতা একটি করিশাবককে স্বহস্তে শল্লকীর পল্লবাগ্রভাগ ভোজন করাইয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এখন সেই করিশাবকও ছিল। এইমাত্র সে বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছে। এক মত্ত যূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তৎপ্রতি আক্রমণ করিল। সীতা

তাহা দেখেন নাই। কিন্তু অন্যত্রস্থিতা বাসন্তী দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাসন্তী তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, "সর্ব্বনাশ হইল, সীতার পালিত করিকরভকে মারিয়া ফেলিল!" রব সীতার কর্ণে গেল। সেই জনস্থান, সেই পঞ্চবটী! সেই বাসন্তী! সেই করিকরভ! সীতার ভ্রান্তি জন্মিল। পুত্রীকৃত হস্তিশাবকের বিপদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া তিনি ডাকিলেন, "আর্য্যপুত্র! আমার পুত্রকে বাঁচাও!" কি ভ্রম! আর্য্যপুত্র? কোথায় আর্য্যপুত্র? আজি বার বৎসর সে নাম নাই! অমনি সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে রামচন্দ্র লোপামুদ্রার আহ্বানুসারে অগস্ত্যাশ্রমে যাইতেছিলেন। পঞ্চবটী বিচরণ করিবার মানসে সেই খানে বিমান রাখিতে বলিলেন। সে কথার শব্দ মূর্চ্ছিতা সীতার কাণে গেল। অমনি সীতার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল—সীতা ভয়ে, আহ্লাদে, উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "একি এ? জলভরা মেঘের স্তনিতগম্ভীর মহাশব্দের মত কে কথা কহিল? আমার কর্ণবিবর যে ভরিয়াগেল! আজি কে আমা হেন মন্দভাগিনীকে সহসা আহ্লাদিত করিল?" দেখিয়া তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তমসা বলিলেন, "কেন বাছা একটা অপরিস্ফুট শব্দ শুনিয়া মেঘের ডাকে ময়ূরীর মত চমকিয়া উঠিলি?" সীতা বলিলেন, "কি বলিলে ভগবতি? অপরিস্ফুট? আমি যে স্বরেই চিনেছি আমার সেই আর্য্যপুত্র কথা কহিতেছেন।" তমসা তখন দেখিলেন, আর লুকান বৃথা—বলিলেন, "শুনিয়াছি মহারাজ রামচন্দ্র কোন শূদ্র তাপসের দণ্ড জন্য এই জনস্থানে আসিয়াছেন।" শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? বার বৎসরের পর স্বামী নিকটে, নয়নের পুত্তলীর অধিক প্রিয়, হৃদয়ের শোণিতেরও অধিক প্রিয়, সেই স্বামী আজি বার বৎস-

রের পর নিকটে, শুনিয়া সীতা কি বলিলেন? শুনিয়া সীতা কিছুই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন না—"কই স্বামী—কোথায় সে প্রাণাধিক?" বলিয়া দেখিবার জন্য তমসাকে উৎপীড়িতা করিলেন না, কেবল বলিলেন—

"দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মোক্‌খুসো রাআ।"—"সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ত্রুটি হইতেছে না।"

যে কোন ভাষায় যে কোন নাটকে যাহা কিছু আছে, এতদংশ সৌন্দর্য্যে তাহার তুল্য, সন্দেহ নাই। "দিঠ্ঠিআ অপরিহীনরাঅধম্মোক্‌ খু সো রাআ।" এই রূপ বাক্য কেবল সেক্ষপীয়রেই পাওয়া যায়। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া সীতা আহ্লাদের কথা কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্ম পালনে ত্রুটি হইতেছে না।" কিন্তু দূর হইতে রামের সেই বিরহক্লিষ্ট প্রভাতচন্দ্রমণ্ডলবৎ আকার দেখিয়া, "সখি, আমায় ধর" বলিয়া তমসাকে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। এ দিকে রাম পঞ্চবটী দেখিতে২, সীতাবিরহপ্রদীপ্তানলে পুড়িতে২, "সীতে! সীতে!" বলিয়া ডাকিতে২, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেখিয়া সীতাও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলা তমসার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ডাকিলেন, "ভগবতি তমসে! রক্ষা কর! রক্ষা কর! আমার স্বামীকে বাঁচাও!"

তমসা বলিলেন, "তুমিই বাঁচাও। তোমার স্পর্শে উনি বাঁচিতে পারেন।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "যা হউক তা হউক, আমি তাহাই করিব!" এই বলিয়া সীতা রামকে স্পর্শ করিলেন। (১) রাম চেতনা প্রাপ্ত হইলেন।

---

(১) "যা হউক তা হউক।" এই কথার কত অর্থগাম্ভীর্য্য! বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাক্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে "আমার পাণিস্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কি না, জানি না, কিন্তু ভগবতী

পরে সীতার পূর্ব্বকালের প্রিয়সখী, বনদেবতা বাসন্তী, সীতার পুত্রীকৃত করিশাবকের সহায়ান্বেষণ করিতে২ সেইখানে উপস্থিতা হইলেন। রামের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায়, রাম করিশিশুর রক্ষার্থ গেলেন। সেই হস্তিশিশু স্বয়ং শত্রুজয় করিয়া করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্বর্ণনা অতি মধুর।

যেনোদ্গচ্ছদ্বিসকিশলয়স্নিগ্ধ দন্তাঙ্কুরেণ
ব্যাকৃষ্টস্তে সুতনু লবলীপল্লবঃ কর্ণপূরাৎ।
সোয়ং পুত্রস্তব মদমুচাং বারণানাং বিজেতা
যৎ কল্যাণং বয়সি তরুণে ভাজনং তস্য জাতঃ।
সখি বাসন্তি পশ্য পশ্য কান্তানুবৃত্তিচাতুর্য্য মপি শিক্ষিতং বৎসেন।
লীলোৎখাতমৃণালকাণ্ডকবলচ্ছেদেষু সম্পাদিতাঃ
পুষ্পৎ পুষ্করবাসিতস্য পয়সো গণ্ডূষসংক্রান্তয়ঃ।

বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব।” ইহাতে এই বুঝিতে হইতেছে যে পাণিস্পর্শ সফল হইবে কি না, এই সন্দেহেই সীতা বলিলেন, “যা হউক তা হউক!” কিন্তু আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় যে সে সন্দেহে সীতা বলেন নাই যে, “যা হবার হউক!” সীতা ভাবিয়াছিলেন, “রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—বিসর্জ্জন করিবার সময়ে একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম—আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পত্নীর মত তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক তা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিব।” তাই ভাবিয়াই সীতাস্পর্শে রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলে, সীতা বলিলেন “ভঅবদি তমসে! ওসরহ্ম জইদাবং মং পেক্‌খিস্সদি তদো অণব্ভণুণ্ণাদসণ্ণিধাণেণ অহিঅদরং মম মহারাও কুবিস্সদি।” তবু “মম মহারাও!”

সেকঃ শীকরিণা করেণ বিহিতং কামং বিরামে পুন-
র্যৎস্নেহাদনরালনালনলিনী পত্রাতপত্রং ধৃতম্। (১)

এদিকে পুত্রীকৃত করী দেখিয়া সীতার গর্ভজপুত্রদিগকে মনে পড়িল। কেবল স্বামিদর্শনে বঞ্চিতা নহেন,—পুত্রমুখ দর্শনেও বঞ্চিতা। সেই মাতৃমুখনির্গত পুত্রমুখস্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া অদ্য বিরত হইব।

মমপুত্তকাণং ইসিবিরলকোমলধঅলদসণুজ্জল কবোলং অণুবদ্ধ মুদ্ধকাঅলিবিহসিদং ণিবদ্ধকাঅসিহণ্ডঅং অমলমুহপুণ্ডরীঅজুঅলং ণ পরিচুম্বিদং অজ্জউত্তেণ। (২)

সেই গোদবরীশীকরশীতল শঞ্চবটী বনে, রাম, বাসন্তীর আহ্বানে উপবেশন করিলেন। দূরে, গিরিগহ্বরগত গোদাবরীর বারিরাশির গদ্গদ নিনাদ শুনা যাইতেছে। সম্মুখে পরস্পর প্রতিঘাতসঙ্কুল উত্তালতরঙ্গ সরিৎসঙ্গম দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে শ্যামচ্ছবি অনন্ত কাননশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। চারিদিকে সীতার পূর্ব্বসহবাসচিহ্ন সকল বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

(১) যে নবোদ্গত মৃণাল পল্লবের ন্যায় কোমল দন্তদ্বারা তোমার কর্ণদেশ হইতে ক্ষুদ্র২ লবলী পল্লব টানিয়া লইত, সেই তোমার পুত্র মদমত্ত বারণগণকে জয় করিল, সুতরাং এখনই সে যুবাবয়সের কল্যাণভাজন হইয়াছে। * * সখি বাসন্তি দেখ, বাছা কেমন নিজ কান্তার মনোরঞ্জন নৈপুণ্যও শিখিয়াছে। খেলা করিতে২ মৃণালকাণ্ড উৎপাটিত করিয়া তাহার গ্রাসের অংশে সুগন্ধি পদ্মসুবাসিত জলের গণ্ডুষ মিশাইয়া দিতেছে; এবং শুণ্ডের দ্বারা পর্য্যাপ্ত জলকণায় তাহাকে সিক্ত করিয়া,স্নেহে অবক্রদণ্ড নলিনী পত্রের আতপত্র ধরিতেছে।

(২) আমার সেই পুত্রদুটির অমলমুখপদ্মযুগল, যাহাতে কপোলদেশ ঈষদ্বিরল এবং কোমল ধবল দশনে উজ্জ্বল, যাহাতে মৃদুমধুর হাসির অব্যক্তধ্বনি অবিরল লাগিয়া রহিয়াছে, যাহাতে কাকপক্ষ নিবদ্ধ আছে, তাহা আর্য্যপুত্র কর্ত্তৃক পরিচুম্বিত হইল না!

তথায়, একটি কদলীবনমধ্যবর্ত্তী শীলাতলে, পূর্ব্বপ্রবাসকালে, রাম সীতার সঙ্গে শয়ন করিতেন; সেইখানে বসিয়া সীতা হরিণশিশুগণকে তৃণ খাওয়াইতেন; এখনও হরিণেরা সেই প্রেমে সেইখানে ফিরিয়া বেড়াইতেছে। বাসন্তী সেইখানে রামকে বসিতে বলিলেন। রাম সেখানে না বসিয়া, অন্যত্র উপবেশন করিলেন। সীতা, পূর্ব্বে পঞ্চবটী বাসকালে একটি ময়ূরশিশু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। একটি কদম্ববৃক্ষ সীতা স্বহস্তে রোপণ করিয়া, স্বয়ং বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। রাম দেখিলেন, যে সেই কদম্ববৃক্ষে দুই একটি নবকুসুমোদ্গম হইয়াছে। তদুপরি আরোহণ করিয়া সীতাপালিত সেই ময়ূরটি নৃত্যান্তে ময়ূরী সঙ্গে রব করিতেছিল। বাসন্তী রামকে সেই ময়ূরটী দেখাইলেন। দেখিয়া রামের মনে পড়িল, সীতা তাহাকে করতালী দিয়া নাচাইতেন, নাচাইবার সময়ে তালের সহিত সীতার চক্ষুও পল্লবমধ্যে ঘুরিত। এইরূপে বাসন্তী রামকে পূর্ব্বস্মৃতিপীড়িত করিয়া,—সখীনির্ব্বাসনজনিত রাগেই এইরূপ পীড়িত করিয়া, প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন ত?" কিন্তু সেকথা রামেব কানে গেল না —তিনি সীতাকরকমলবিকীর্ণ জলে পরিবর্দ্ধিত বৃক্ষ, সীতাকরকমলবিকীর্ণ নীবারে পুষ্ট পক্ষী, সীতাকরকমলবিকীর্ণ তৃণে প্রতিপালিত হরিণগণকেই দেখিতেছিলেন। বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ কেমন আছেন?" এবার রাম কথা শুনিতে পাইলেন, কিন্তু ভাবিলেন, বাসন্তী "মহারাজ!" বলিয়া সম্বোধন করিলেন কেন? এ ত নিষ্প্রণয় সম্বোধন। আর কেবল কুমার লক্ষ্মণের কথাই জিজ্ঞাসিলেন, তবে বাসন্তী সীতাবিসর্জ্জনবৃত্তান্ত জানেন। রাম প্রকাশ্যে কেবল বলিলেন, "কুমারের কুশল," এই বলিয়া নীরবে রোদন করিতে

আসিলেন। বাসন্তী তখন মুক্তকণ্ঠা হইয়া কহিলেন, "দেব! এত কঠিন হইলে কি প্রকারে?

> ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
> ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।

তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি নয়নের কৌমুদী, অঙ্গে তুমি আমার অমৃত,—এইরূপ শতং প্রিয় সম্বোধনে যাহাকে ভুলাইতে তাহাকে—" বলিতেং সীতাস্মৃতিমুগ্ধা বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না। অচেতন হইলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। চেতনা পাইয়া বাসন্তী কহিলেন "আপনি কেমন করিয়া একার্য্য করিলেন?"

রাম। লোকে বুঝে না বলিয়া।

বাসন্তী। কেন বুঝে না?

রাম। তাহারাই জানে।

তখন বাসন্তী আর সহিতে পারিলেন না। বলিলেন, "নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, কেবল যশঃ তোমার অত্যন্ত প্রিয়!"

এই কথোপকথনের প্রশংসা করা বৃথা। সীতাবিসর্জ্জন জন্য বাসন্তী রামপ্রতি ক্রোধযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি মানসিক যন্ত্রণাস্বরূপ সেই অপরাধের দণ্ড প্রণীত করিলেন; সহজেই রামের শোকসাগর উছলিয়া উঠিল। রামের যে একমাত্র শোকোপশমের উপায় ছিল—আত্মপ্রসাদ,—তাহাও বিনষ্ট করিলেন। রাম জানিতেন যে তিনি প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্ম্মের রক্ষার্থই সীতাবিসর্জ্জনরূপ মর্ম্মচ্ছেদী কার্য্য করিয়াছেন।—মর্ম্মচ্ছেদ হউক, ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছে। বাসন্তী দেখিলেন যে সে ধর্ম্মরক্ষা কেবল স্বার্থপরতার পৃথক্ একটি নামমাত্র। সে কুলধর্ম্ম রক্ষার বাসনা কেবল রূপান্তরিত যশোলিপ্সা মাত্র। কেবল যশোলাভের স্বার্থপর বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া রাম এই

কাজ করিয়াছেন। বাসন্তী আরও দেখিলেন যে, যে যশের আকাঙ্ক্ষায় তিনি এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষাও ফলবতী হয় নাই। তিনি এই প্রকার যশের লাভ লালসায় পত্নীবধরূপ গুরুতর অপযশের ভাগী হইয়াছেন। বনমধ্যে সীতার কি হইল, তাহার স্থিরতা কি? ইহার অপেক্ষা গুরুতর অপযশ আর কি হইতে পারে?

তখন রামের শোকপ্রবাহ আবার অসম্বরণীয় বেগে ছুটিল। সীতার সেই জ্যোৎস্নাময়ী মৃদুমুগ্ধমৃণালকল্প দেহলতিকা কোন হিংস্র পশু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া রাম "সীতে! সীতে!" বলিয়া সেই অরণ্যমধ্যে রোদন করিতে লাগিলেন। কখন বা, যে কলঙ্ককুৎসাকারক পৌরজনের কথায় সীতাবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, "আমি অনেক সহ্য করিয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" বাসন্তী, ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন, "সখি, আবার ধৈর্য্যের কথা কি বল? আজি দ্বাদশ বৎসর সীতাশূন্য জগৎ—সীতা নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—তথাপি বাঁচিয়া আছি—আবার ধৈর্য্য কাহাকে বলে?" রামের অত্যন্ত যন্ত্রণা দেখিয়া বাসন্তী তাঁহাকে জনস্থানের অন্যান্য প্রদেশ দেখিতে অনুরোধ করিলেন। রাম উঠিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাসন্তীর মনে সখীবিসর্জ্জন দুঃখ জ্বলিতেছিল—কিছুতেই ভুলিলেন না। বাসন্তী দেখাইলেন;—

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গ দত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরী সৈকতে।
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভোমুগ্ধঃপ্রণামাঞ্জলিঃ। (১)

(১) সীতা গোদাবরী সৈকতে হংস লইয়া কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তখন তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া

আর রাম সহ্য করিতে পারিলেন না। ভ্রান্তি জন্মিতে লাগিল। তখন উচ্চৈঃস্বরে রাম ডাকিতে লাগিলেন, "চণ্ডি জানকি, এই যে চারিদিকে তোমাকে দেখিতেছি—কেন দয়া কর না? আমার বুক ফাটিতেছে; দেহবন্ধ ছিঁড়িতেছে; জগৎ শূন্য দেখিতেছি; নিরন্তর অন্তর জ্বলিতেছে; আমার বিকল অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া অন্ধকারে ডুবিতেছে; মোহ আমাকে চারিদিক্ হইতে আচ্ছন্ন করিতেছে; আমি মন্দভাগ্য—এখন কি করিব?" বলিতে২ রাম মূৰ্চ্ছিত হইলেন।

ছায়ারূপিণী তমসার সঙ্গে আদ্যোপান্ত নিকটে ছিলেন। বাসন্তী রামকে সীতা পীড়িত করিতেছেন দেখিয়া, সীতা পুনঃ২ তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছিলেন—কতবার রামের রোদন শুনিয়া আপনি মর্ম্মপীড়িত হইতেছিলেন, আবার সীতা রাম চন্দ্রের দুঃখের কারণ হইলেন বলিয়া, কত কাতরোক্তি করিতেছিলেন। আবার রামকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সীতা কাঁদিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র। তুমি যে সকল জীবলোকের মঙ্গলাধার! তুমি এ মন্দভাগিনীকে মনে করিয়া বার২ সংশয়িতজীবন হইতেছ? আমি যে মলেম!" এই বলিয়া সীতাও মূর্চ্ছিতা প্রায়! তমসা এবং বাসন্তী তাঁহাকে উঠাইলেন। সীতা সসম্ভ্রমে রামের ললাট স্পর্শ করিলেন। কি স্পর্শসুখ! রাম যদি মৃৎপিণ্ড হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার চেতনা হইত। আনন্দনিমিলিতলোচনে স্পর্শসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন, তাঁহার শরীরধাতু অন্তরে বাহিরে অমৃতময় প্রলেপে যেন লিপ্ত হইল—জ্ঞান লাভ করিলেও আনন্দেতে আর এক প্রকার মোহ

তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে। সীতা আসিয়া তোমাকে বিশেষ দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া, তোমাকে প্রণাম করিবার জন্য পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলির দ্বারা কি সুন্দর অঞ্জলিবদ্ধ করিতেন।

তাঁহাকে অভিভূত করিল। রাম বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি বাসন্তি। বুঝি অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল!"

বাসন্তী। কিসে?

রাম। আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি।

বাসন্তী। কৈ তিনি?

রাম। এই যে আমার সম্মুখেই রহিয়াছেন।

বাসন্তী। মর্ম্মভেদী প্রলাপ বাক্যে আমি একে প্রিয়সখীর দুঃখে জলিতেছি, তাহাতে আবার এমনতর এ হতভাগিনীকে কেন জ্বালাইতেছেন?

রাম বলিলেন, "সখি, প্রলাপ কই? বিবাহকালে বৈবাহিক মঙ্গল সূত্রযুক্ত যে হাত আমি ধরিয়াছিলাম—আর যে হাতের অমৃতশীতল স্বেচ্ছালব্ধ সুখস্পর্শে চিনিতে পারিতেছি, এ ত সেই হাত! সেই তুহিন সদৃশ, বর্ষাকরকতুল্য শীতল কোমল লবলী বৃক্ষের নবাঙ্কুর তুল্য হস্তই আমি পাইয়াছি!

এই বলিয়া রাম তাঁহার ললাটস্থ সীতার অদৃশ্য হস্ত গ্রহণ করিলেন। সীতা ইতিপূর্ব্বেই রামের আনন্দমোহ দেখিয়া অপসৃত হইবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু সেই চিরসদ্ভাব-সৌম্য শীতল স্বামিস্পর্শে তিনিও মুগ্ধা হইলেন; অতি যত্নে সেই রামললাটস্থিতহস্তকে ধরিয়া রাখিলেও সে হস্ত কাঁপিতে লাগিল, ঘামিতে লাগিল, এবং জড়বৎ হইয়া অবশ হইয়া আসিতে লাগিল! যখন রাম, সীতার হস্তের চিরপরিচিত অমৃত-শীতল সুখস্পর্শের কথা বলিলেন, সীতা মনে২ বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আজিও তুমি সেই আর্য্যপুত্রই আছ!" শেষে যখন রাম সীতার করগ্রহণ করিলেন, তখন সীতা দেখিলেন, স্পর্শ মোহে প্রমাদ ঘটিল। কিন্তু রাম সে হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না, আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া

আসিয়াছিল, তিনি বাসন্তীকে বলিলেন, "সখি, তুমি একবার ধর।" সীতা সেই অবকাশে হাত ছাড়াইয়া লইলেন। লইয়া, স্পর্শসুখজনিত স্বেদরোমাঞ্চকম্পিতকলেবরা হইয়া পবনকম্পিত নবজলকণাসিক্ত স্ফুটকোরক কদম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। মনে করিলেন, "কি লজ্জা, তমসা দেখিয়া কি মনে করিতেছেন। ভাবিতেছেন, এই ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, আবার ইহাঁর প্রতি এই অনুরাগ।"

রাম ক্রমে জানিতে পারিলেন, যে কই, কোথা সীতা—সীতা ত নাই। তখন রামের শোকপ্রবাহ দ্বিগুণ ছুটিল। রোদন করিয়া, ক্রমে শান্ত হইয়া বাসন্তীকে বলিলেন, "আর কতক্ষণ তোমাকে কাঁদাইব? আমি এখন যাই।" শুনিয়া সীতা উদ্বেগের সহিত তমসাকে অবলম্বন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবতি তমসে! আর্য্যপুত্র যে চলিলেন?" তমসা বলিলেন, "চল, আমরাও যাই।" সীতা বলিলেন, "ভগবতি ক্ষমা কর! আমি ক্ষণকাল এই দুর্ল্লভ জনকে দেখিয়া লই।" কিন্তু বলিতে২ এক বজ্রতুল্য কঠিন কথা সীতার কানে গেল, রাম বাসন্তীর নিকট বলিতেছেন, "অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী আছে—" সহধর্ম্মিণী! সীতা কম্পিতকলেবরা হইয়া মনে২ বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! কে সে?" এই অবসরে রামও কথা সমাপ্ত করিলেন, "সে সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।" শুনিয়া সীতার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল; বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! এখন তুমি তুমি হইলে। এতদিনে আমার পরিত্যাগ লজ্জাশল্য বিমোচন করিলে!" রাম বলিতেছেন, "তাহারই দ্বারা আমার বাষ্পদিগ্ধ চক্ষুর বিনোদন করি।" শুনিয়া সীতা বলিলেন, "তুমি যার এত আদর কর, সেই ধন্য। তোমার যে বিনোদন করে সেই ধন্য। সে জীবলোকের আশানিবন্ধন হইয়াছে।"

রাম চলিলেন। দেখিয়া সীতা করযোড়ে, "নমো নমো অপূর্ব্বপুণ্যজণিদদংসণাণং অজ্জউত্তচরণকমলাণং" এই বলিয়া প্রণাম করিতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা বলিলেন, "আমার এ মেঘান্তরে ক্ষণকালজন্য পূর্ণিমাচন্দ্র দেখা মাত্র!"

তৃতীয়াঙ্কের স্থূল মর্ম্ম এই। এই অঙ্কের অনেক দোষ আছে। ইহা নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক। নাটকের যাহা কার্য্য, বিসর্জ্জনান্তে রাম সীতার পুনর্ম্মিলন, তাহার সঙ্গে ইহার কোন সংশ্রব নাই। এই অঙ্ক পরিত্যক্ত হইলে নাটকের কার্য্যের কোন হানি হয় না। সচরাচর এরূপ একটি সুদীর্ঘ নাটকাঙ্ক নাটক মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া, বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হয়। যাহা কিছু নাটকে প্রতিকৃত হইবে, তাহা উপসংহৃতির উদ্যোজক হওয়া উচিত। এই অঙ্ক কোন অংশে তদ্রূপ নহে। বিশেষ, ইহাতে রামবিলাপের দৈর্ঘ্য এবং পৌনঃপুন্য অসহ্য। তাহাতে রচনাকৌশলের বিপর্য্যয় হইয়াছে। কিন্তু অনেকেই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, যে অন্য অনেক নাটক একবারে বিলুপ্ত হয়, বরং তাহাও স্বীকর্ত্তব্য, তথাপি উত্তরচরিতের এই তৃতীয়াঙ্ক ত্যাগ করা যাইতে পারে না। নাটকাংশে ইহা যতই দূষ্য হউক না কেন, কাব্যাংশে ইহার তুল্য রচনা অতি দুর্লভ।

উত্তরচরিত সমালোচন ক্রমে এত দীর্ঘায়ত হইয়া উঠিয়াছে, যে আর ইহাতে অধিক স্থান নিয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব অবশিষ্ট কয় অঙ্কের সমালোচনা অতি সংক্ষেপে করিব।

এ দিকে বাল্মীকি প্রচার করিলেন যে তিনি এক অভিনব নাটক রচনা করিয়াছেন। তদভিনয় দর্শন জন্য সকল লোককে

নিমন্ত্রিত করিলেন। তদ্দর্শনার্থ বশিষ্ঠ, অরুন্ধতী, কৌশল্যা, জনক, প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন। তথায় লবের সুন্দর কান্তি এবং রামের সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া কৌশল্যা অত্যন্ত ঔৎসুক্যপরবশ হইয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। দুহিতৃবিয়োগে জনকের শোকক্লিষ্টদশা, কৌশল্যার সহিত তাঁহার আলাপ, লবের সহিত কৌশল্যার আলাপ, ইত্যাদি অতি মনোহর, কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিবার আর অবকাশ নাই।

চন্দ্রকেতু, অশ্বমেধের অশ্বরক্ষক সৈন্য লইয়া বাল্মীকির আশ্রম সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে সৈন্যদিগের সহিত লবের বচসা হওয়ায় লব অশ্ব হরণ করিলেন, এবং যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদিগকে পরাস্ত করিলেন। চন্দ্রকেতু আসিয়া তাহাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। চন্দ্রকেতু এবং লব পরস্পরের প্রতি বিপক্ষতাচরণ কালে এত দূর উভয়ে উভয়ের প্রতি সৌজন্য এবং সদ্ব্যবহার করিলেন যে ইহা, নাটকের এতদংশ পড়িয়া বোধ হয় যে, সভ্যতার চূড়াপদবাচ্য কোন ইউরোপীয় জাতি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। ভবভূতির সময়ে ভারতবর্ষীয়েরা সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, ইহা তাহার এক প্রমাণ।

আকাশে যেরূপ নক্ষত্র ছড়ান, ভবভূতির রচনা মধ্যে সেইরূপ কবিত্বরত্ন ছড়ান আছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম অঙ্ক হইতে এই সকল রত্ন আহরণ করিতে পারিলাম না, তথাপি পঞ্চম হইতে দুই একটি উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। লব চন্দ্রকেতুর সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দ্রকেতু তাঁহাকে যুদ্ধে আহ্বান করাতে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকেতুর দিকে ধাবমান হইলেন, "জনয়িষু রবাদিতা-

ঘলীনামবমৰ্দ্দাদিব দৃপ্ত সিংহশাবঃ।" (১) তিনি চন্দ্রকেতুর দিকে আসিতেছেন, পরাজিত সৈন্যগণ তখন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে;—

> দৰ্পেণ কৌতুকবতা ময়ি বদ্ধলক্ষ্যঃ
> পশ্চাদ্বলৈরনুসৃতোহয়মুদীর্ণধন্বা।
> দ্বেধা সমুদ্ধতমরুত্তরলস্য ধত্তে
> মেঘস্য মাঘবতচাপধরস্য লক্ষ্মীম্॥ (২)

নিঃসহায় পাদচারী বালকের প্রতি বহুসেনা ধাবমান দেখিয়া চন্দ্রকেতু তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। দেখিয়া লব ভাবিলেন, "কথমনুকম্পতে মাম্?" ভারতবর্ষীয় কোন গ্রন্থে এরূপ বাক্য প্রযুক্ত আছে, একথা অনেক ইউরোপীয়ে সহজে বিশ্বাস করিবেন না।

লব কর্ত্তৃক জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ বর্ণনা অস্বাভাবিক, অতিপ্রাকৃত, এবং অস্পষ্ট হইলেও, আমরা তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না;—

> পাতালোদর কুঞ্জ পুঞ্জিততমঃশ্যামৈর্নভোজৃম্ভকৈ
> রুত্তপ্তস্ফুরদার কূটকপিলজ্যোতির্জ্জ্বলদ্দীপ্তিভিঃ।
> কল্পাক্ষেপ কঠোরভৈরবমরুদ্ব্যস্তৈরবস্তীর্য্যতে
> নীলম্ভোদতড়িৎকড়ারকুহরৈর্বিন্ধ্যাদ্রিকূটৈরিব।(৩)

---

(১) যেমন মেঘের শব্দ শুনিয়া, দৃপ্ত সিংহশিশুও হস্তি বিনাশ হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ।

(২) সকৌতুক দর্পে আমার প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধনু উত্থিত করিয়া, সৈন্যের দ্বারা পশ্চাতে অনুসৃত হইয়া, ইনি, দুই দিগ্ হইতে বায়ু সঞ্চালিত এবং ইন্দ্রধনু শোভিত মেঘের মত দেখাইতেছেন।

(৩) পাতালাভ্যন্তরবর্ত্তী কুঞ্জমধ্যে রাশীকৃত অন্ধকারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তপ্ত প্রদীপ্ত পিত্তলের পিঙ্গলবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট

লবের সহিত রামের রূপসাদৃশ্য দেখিয়া, সুমন্ত্রের মনে এক বার আশা জন্মিয়াই, সীতা নাই, এই কথা মনে পড়াতে সে আশা তখনই নিবারিত হইল। ভাবিলেন, "লতায়াং পূর্ব্বলূনায়াং প্রসূনস্যাগমঃ কুতঃ।" বৃদ্ধ সুমন্ত্রের মুখে এই বাক্য শুনিয়া, সহৃদয় পাঠকের রোমিও সম্বন্ধে বৃদ্ধ মণ্টাগুর মুখে কীটদংশিত কুসুমকোরকের উপমা মনে পড়িবে।

ষষ্ঠাঙ্কের বিষ্কম্ভকটি বিশেষ মনোহর। বিদ্যাধরমিথুন, গগন মার্গে থাকিয়া লবচন্দ্রকেতুর যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। যুদ্ধ তাঁহাদিগের কথোপকথনে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন যে ভবভূতির কাব্যের "মধ্যে২ সংস্কৃতে এবং প্রাকৃতে এমত দীর্ঘ সমাস ঘটিত রচনা আছে, যে তাহাতে অর্থ বোধ ও রসগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে।" ভবভূতির অসাধারণ দোষ নির্ব্বাচনকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই কথা বলিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে যাহা উত্তরচরিত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তন্মধ্যে এইরূপ দীর্ঘ সমাসের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। এই বিষ্কম্ভক মধ্যে ঐরূপ দীর্ঘ সমাসের বিশেষ আধিক্য। আমরা কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি, যথা পুষ্পবৃষ্টিঃ;—

"অবিরলললিতবিকচকনককমল কমনীয় সংহতিঃ অমরতরু তরুণ মণিমুকুলনিকরমকরন্দসুন্দরঃ পুষ্পনিপাতঃ।

পুনশ্চ, বাণসৃষ্ট অগ্নি;—

"উচ্চণ্ডবজ্রখণ্ডাবস্ফোটপটুতরস্ফুলিঙ্গবিকৃতিঃ উত্তালতুমুললেলিহানজ্বালাসম্ভারভৈরবো ভগবান্ উষর্ব্বুধঃ"

জম্বুকারগুলির দ্বারা আকাশমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়কালীন দুর্নিবার ভৈরব বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত এবং মেঘমিলিত বিদ্যুৎ কর্ত্তৃক পিঙ্গল বর্ণ এবং গুহামুখ বিদ্যাত্রিশিখর ব্যাপ্তবৎ দেখাইতেছে।

পুনশ্চ, বর্ষাকালে স্থূল মেঘ;—

"অবিরলবিলোলধুমন্তবিজ্জুলদাবিলাসমণ্ডিতেহিং মত্তমোর-কণ্ঠসামলেহিং জলহরেহিং।"

এবং তৎকালে সৃষ্টির অবস্থা;—

"প্রবলবাতাবলিক্ষোভগম্ভীরগুণগুণায়মানমেঘমেদুরান্ধকার-নীরন্ধ্রনিবদ্ধম্ একবারবিশ্বগ্রসনবিকটবিকরাল কালকণ্ঠকণ্ঠকন্দর-বিবর্ত্তমানমিব যুগান্তযোগনিদ্রানিরুদ্ধসর্ব্বদ্বারনারায়ণোদরনিবিষ্ট-মিব ভূতজাতং প্রবেপতে।"

ঈদৃশ দীর্ঘ সমাস যে রচনার দোষমধ্যে গণ্য, তাহা আমরা স্বীকার করি। যাহা কিছুতে অর্থ বোধের বিঘ্ন হয়, তাহাই দোষ। ঈদৃশ সমাসে অর্থ বোধের হানি, সুতরাং ইহা দোষ। নাটকে ইহা যে বিশেষ দোষ, তাহাও স্বীকার করি, কেন না ইহাতে নাটকের অভিনয়োপযোগিতার হানি হয়। তথাপি ভবভূতির এই কয় সমাসের মধ্যে যে কবিত্ব শক্তি আছে, রত্নাবলী নাটকের একটি সমগ্র অঙ্কমধ্যে তাহা আছে কি না, সন্দেহ।

লব ও চন্দ্রকেতু যুদ্ধ করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাম সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তিনি উভয়কে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিলেন। লব তাঁহাকে রাজা রামচন্দ্র বলিয়া জানিতে পারিয়া, ভক্তিভাবে প্রণাম ও নম্রভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলেন। কুশও যুদ্ধ সম্বাদ শুনিয়া সে স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং লব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া রামের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। রাম উভয়কে সস্নেহ আলিঙ্গন এবং পিতৃযোগ্য প্রণয়সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। পরে সকলে, বাল্মীকির আশ্রমে, তৎপ্রণীত নাটকাভিনয় দেখিতে গেলেন।

তথায় রামাজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ দ্রষ্টৃবর্গকে যথাস্থানে সন্নি-বেশিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পৌরগণ, জন-

পদবাসী প্রজা, ও দেবাসুর এবং ইতর জীব, স্থাবর জঙ্গম সকলে ঋষিপ্রভাববলে সমাগত হইয়া, লক্ষ্মণকর্ত্তৃক যথা স্থানে সন্নিবেশিত হইলেন। পরে অভিনয়ারম্ভ হইল। রাম ও লবকুশ দ্রষ্টৃবর্গ মধ্যে ছিলেন।

সীতা বিসর্জ্জন বৃত্তান্তই এই অদ্ভুত নাটকের প্রথমাংশ। সীতা লক্ষ্মণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, তাঁহার কাতরতা, গঙ্গা-প্রবাহে দেহসমর্পণ, তন্মধ্যে যমজসন্তান প্রসব, গঙ্গা এবং পৃথিবীকর্ত্তৃক তাঁহার ও শিশুদিগের রক্ষা, ও তৎসঙ্গে সীতার প্রস্থান ইত্যাদি অভিনীত হইল। দেখিয়া রাম মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন লক্ষ্মণ উচ্চৈঃস্বরে বাল্মীকিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবন! রক্ষা করুন! আপনার কাব্যের কি মর্ম্ম?" নটদিগকে বলিলেন, "তোমরা অভিনয় বন্ধ কর।"

তখন সহসা দেবর্ষি কর্ত্তৃক অকরীগ ব্যাপ্ত হইল। গঙ্গার বারিরাশি মথিত হইল। ভাগীরথী এবং পৃথিবীর সহিত জল মধ্য হইতে উঠিলেন—সেই স্বয়ং সীতা। দেখিয়া লক্ষ্মণ বিস্মিত এবং আহ্লাদিত হইয়া রামকে ডাকিলেন, "দেখুন! দেখুন!" কিন্তু রাম তখনও অচেতন। তখন সীতা অরুন্ধতী কর্ত্তৃক আদিষ্টা হইয়া রামকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন, "উঠ, আর্য্য পুত্র!"

রাম চেতনাপ্রাপ্ত হইলেন। পরে যাহা ঘটিল, বলা বাহুল্য। সেই সর্ব্বলোক সমারোহ সমক্ষে সীতার সতীত্ব দেবগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল। দেববাক্যে প্রজাগণ বুঝিল। সীতা লবকুশকেও পাইলেন। রামও তাঁহাদিগকে পুত্র বলিয়া চিনিলেন। পরে সপুত্রা ভার্য্যা গৃহে লইয়া গিয়া সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

নাটকের ভিতর এই নাটকখানি যিনি অভিনীত দেখিবেন বা পাঠ করিবেন, তিনিই যে অশ্রুপাত করিবেন, তদ্বিষয়ে

সংশয় নাই। কিন্তু আমরা এতদংশ উদ্ধৃত করিলাম না। এই উপসংহার অপেক্ষা রামায়ণের উপসংহার অধিকতর মধুর এবং করুণ রসপূর্ণ। আমরা পাঠকের প্রীতার্থে তাহাই উদ্ধৃত করিতে বাসনা করি। বাল্মীকি কর্তৃক সীতা অযোধ্যায় আনীত হয়েন। যে সূচনায় ঋষি সীতাকে আনয়ন করেন, তদ্বিশেষ বঙ্গীয় পাঠকমাত্রেই "সীতার বনবাস" পাঠ করিয়া অবগত আছেন।—সতীত্ব সম্বন্ধে শপথ করিলে সীতাকে গ্রহণ করিবেন, রাম এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা প্রচার হইলে পর, সীতাশপথ দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইল।

১০৯ সর্গ।

তস্যাং রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং যজ্ঞবাটং গতোনৃপঃ।
ঋষীন্ সর্ব্বান্ মহাতেজাঃ শব্দাপয়তি রাঘবঃ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথকাশ্যপঃ।
বিশ্বামিত্রোদীর্ঘতপা দুর্ব্বাসাশ্চ মহাতপাঃ॥
পুলস্ত্যোপিতথা শক্তির্ভার্গবশ্চৈব বামনঃ।
মার্কণ্ডেয়শ্চদীর্ঘায়ুর্মৌদ্গল্যশ্চ মহাযশাঃ॥
গর্গশ্চ চ্যবনশ্চৈব শতানন্দশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
ভরদ্বাজশ্চ তেজস্বী অগ্নিপুত্রশ্চসুপ্রভঃ॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব গৌতমশ্চ মহাযশাঃ।
এতেচান্যেচবহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥
কৌতূহলসমাবিষ্টাঃ সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
রাক্ষসাশ্চ মহাবীর্য্যা বানরাশ্চ মহাবলাঃ॥
সর্ব্বএব সমাজগ্মুর্মহাত্মানঃ কুতূহলাৎ।
ক্ষত্রিয়াশ্চ শূদ্রাশ্চ বৈশ্যাশ্চৈব সহস্রশঃ॥
নানাদেশগতাশ্চৈব ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
সীতাশপথ বীক্ষার্থং সর্ব্বএব সমাগতাঃ॥
তদাসমাগতং সর্ব্ব মশ্মভূতমিবাচলং।
শ্রুত্বা মুনিবরস্তূর্ণং সসীতঃ সমুপাগমৎ॥
তমৃষিং পৃষ্ঠতঃ সীতা অন্বগচ্ছদবাঙ্মুখী।
কৃতাঞ্জলির্বাষ্পাকুলা কৃত্বা রামং মনোগতং॥

তাং দৃষ্ট্বা শ্রুতিমায়ান্তীং ব্রহ্মাণমনুগামিনীং।
বাল্মীকেঃ পৃষ্ঠতঃ সীতাং সাধুবাদো মহানভূৎ ॥
ততো হলহলাশব্দঃ সর্ব্বেষামেবমাবভৌ।
দুঃখজন্মবিশালেন শোকেনাকুলিতাত্মনাং ॥
সাধু রামেতি কেচিত্তু সাধু সীতেতি চাপরে।
উভাবেব চ তত্রান্যে প্রেক্ষকাঃ সংপ্রচুক্রুশুঃ ॥
ততো মধ্যে জনৌঘস্য প্রবিশ্য মুনিপুঙ্গবঃ।
সীতাসহায়ো বাল্মীকি রিতি হোবাচ রাঘবং ॥
ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্ম্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা মমাশ্রম সমীপতঃ ॥
লোকাপবাদ ভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং দাস্যতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥
ইমৌ তু জানকীপুত্রা বুভৌচ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্দ্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে ॥
প্রচেতসোহহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
নস্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ ॥
বহুবর্ষ সহস্রাণি তপশ্চর্য্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলন্তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা ভূতপূর্ব্বং নকিল্বিষং।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি ॥
অহং পঞ্চসু ভূতেষু মনঃ ষষ্ঠেষু রাঘব।
বিচিন্ত্য সীতা শুদ্ধেতি জগ্রাহ বন নির্ঝরে ॥
ইয়ং শুদ্ধসমাচারা অপাপা পতিদেবতা।
লোকাপবাদ ভীতস্য প্রত্যয়ন্তব দাস্যতি ॥
তস্মাদিয়ং নরবরাত্মজ শুদ্ধভাবা।
দিব্যেন দৃষ্টি বিষয়েণ ময়া প্রদিষ্টা ॥
লোকাপবাদ কলুষীকৃতচেতসা যৎ।
ত্যক্তা ত্বয়া প্রিয়তমা বিদিতাপি শুদ্ধা ॥

১১০ সর্গ।

বাল্মীকেনৈব মুক্তস্তু রাঘবঃ প্রত্যভাষত।
প্রাঞ্জলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্বা তাং দেববর্ণিনীং ॥

এবমেতন্মহাভাগ যথাবদসি ধর্ম্মবিৎ।
প্রত্যয়স্তমমব্রহ্মংস্তববাক্যৈরকল্মষৈঃ॥
প্রত্যয়শ্চ পুরাদত্তো বৈদেহ্যা সুরসন্নিধৌ।
শপথশ্চকৃতস্তত্র তেন বেশ্ম প্রবেশিতা॥
লোকাপবাদোবলবান্ যেন ত্যক্তাহিমৈথিলী।
সেয়ংলোকভয়াদ্ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা॥
পরিত্যক্তা ময়া সীতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি।
জানামিচেমৌপুত্রৌ মে যমজাতৌকুশীলবৌ॥
শুদ্ধায়াংজগতোমধ্যে বৈদেহ্যাং প্রীতিরস্তমে।
অভিপ্রায়ন্তু বিজ্ঞায় রামস্য সুরসত্তমাঃ॥
সীতায়াঃ শপথে তস্মিন্ সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্ব্বএব সমাগতাঃ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্গণাঃ।
সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে তে সর্ব্বেচ পরমর্ষয়ঃ॥
নাগাঃসুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্ব্বে হৃষ্টমানসাঃ।
দৃষ্ট্বাদেবানৃষীংশ্চৈব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ।
প্রত্যয়োমে মুনিশ্রেষ্ঠ ঋষিবাক্যৈরকল্মষৈঃ॥
শুদ্ধায়াংজগতো মধ্যে বৈদেহ্যাংপ্রীতিরস্তমে॥
সীতা শপথ সংভ্রান্তাঃ সর্ব্বএব সমাগতাঃ।
ততোবায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ॥
তংজনৌঘং সুরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ামাস সর্ব্বতঃ॥
তদদ্ভুত মিবাচিন্ত্যং নিরৈক্ষন্ত সমাহিতাঃ।
মানবাঃ সর্ব্বরাষ্ট্রেভ্যঃপূর্ব্বং কৃতযুগে যথা॥
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্বা সীতা কাষায়বাসিনী।
অব্রবীৎপ্রাঞ্জলি বাক্যমধোদৃষ্টিরবাঙ্মুখী॥
যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি নচিন্তয়ে।
তথা মে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথামে মাধবীদেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
যথৈতৎসত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎপরং নচ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমর্হতি॥
তথাশপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাদুরাসীত্তদদ্ভুতং।

স্তুতলাদুত্থিতং দিব্যং সিংহাসনমনুত্তমং ॥
ধ্রিয়মানং শিরোভিস্তু নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ।
দিব্যং দিব্যেন বপুষা দিব্যরত্ন বিভূষিতৈঃ ॥
তস্মিংস্তু ধরণীদেবী বাহুভ্যাং গৃহ্যমৈথিলীং।
স্বাগতে নাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥
তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলং।
পুষ্পবৃষ্টিরবিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরৎ ॥
সাধুকারশ্চ সুমহান্দেবানাং সহসোত্থিতঃ।
সাধুসাধ্বিতিবৈসীতে যস্যাস্তে শীলমীদৃশং ॥
এবং বহুবিধাবাচোহ্যন্তরীক্ষগতাঃ সুরাঃ।
ব্যাজহ্রুর্হৃষ্ট মনসো দৃষ্ট্বা সীতা প্রবেশনং ॥
যজ্ঞবাট গতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব্বএবতে।
রাজানশ্চ নরব্যাঘ্রা বিস্ময়ান্নোপরেমিরে ॥
অন্তরীক্ষেচ ভূমৌচ সর্ব্বেস্থাবর জঙ্গমাঃ।
দানবাশ্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥
কেচিদ্বিনেদুঃসংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যান পরায়ণাঃ।
কেচিদ্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিৎ সীতামচেতসঃ ॥
সীতা প্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎ সমাগমঃ।
তন্মুহূর্ত্ত মিবাত্যর্থং সমং সম্মোহিতংজগৎ ॥ ১)

---

(১) সেই রজনী অতিবাহিত হইলে, মহাতেজা রাজা রামচন্দ্র যজ্ঞস্থল গমন পূর্ব্বক ঋষি সকলকে আহ্বান করাইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ, বামদেব, কশ্যপ বংশোদ্ভব জাবালি, দীর্ঘতপা বিশ্বামিত্র, মহাতপা দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব বামন, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ড, মহাযশাঃ মৌদ্গল্য, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত, ও মহাযশা গৌতম, এবং অন্যান্য সংশিতব্রত মুনিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলেই সমাগত হইলেন। মহাবীর্য্য রাক্ষসগণ ও মহাবল বানরগণ মহাত্মা ক্ষত্রিয়গণ, এবং সহস্রং বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং নানা দেশাগত ব্রতধারী ব্রাহ্মণ সকল কুতূহল বশতঃ সীতাশপথ দর্শন জন্য সকলেই সমাগত হইলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি তৎকালে সমাগত জনমণ্ডলী কৌতুকদর্শনার্থ

আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচন করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্ব্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে২ ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ

পর্ব্বতবৎ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান, ইহা শ্রবণ করিয়া সীতা-সহিত শীঘ্র আগমন করিলেন। সীতাও কৃতাঞ্জলি, বাষ্পাকুল নয়না এবং অধোমুখী হইয়া মনোমধ্যে রামকে চিন্তা করিতে২ সেই ঋষির পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মের অনু-গামিনী শ্রুতির ন্যায় বাল্মীকির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী সেই সীতাকে দেখিবামাত্র সেইস্থলে অতি মহৎ সাধুবাদ হইতে লাগিল। তৎপরে দুঃখজ অতিমহৎ শোক হেতু ব্যথিতান্তঃকরণ জন সকলের বিপুল হলহলা শব্দ উত্থিত হইল। দর্শকবৃন্দমধ্যে কতকগুলি সাধু রাম, কতকগুলি সাধু জানকী ও কতকগুলি উভয়ই সাধু, এই প্রকার কহিতে লাগিল।

তদনন্তর মুনিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি সীতা সহিত জনবৃন্দমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, রামকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে দাশরথি! ধর্ম্ম চারিণী, সুব্রতা, এই সীতা লোকাপবাদ হেতু আমার আশ্রম সমীপে পরিত্যক্তা হইয়াছিলেন। হে মহাব্রত রাম! ইনি এক্ষণে লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন; তুমি অনুজ্ঞা কর। এই দুই দুর্দ্ধর্ষ যমল জানকীপুত্র তোমারই পুত্র, ইহা আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি। হে রাঘব নন্দন! আমি প্রচেতার দশম পুত্র, আমি মিথ্যা বাক্য স্মরণও করি না; ইহারা তোমারই পুত্র। আমি বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করি-য়াছি; যদ্যপি এই জানকী দুশ্চারিণী হয়েন তাহা হইলে আমি যেন তাহার ফলপ্রাপ্ত না হই। কায়োমনে এবং কর্ম্মদ্বারা আমি পূর্ব্বে কখনই পাপাচরণ করি নাই; যদ্যপি জানকী নিষ্পাপা হয়েন তবে আমি যেন তাহার ফলভোগ করিতে পারি। হে রাঘব! আমি পঞ্চভূত ও ষষ্ঠ স্থানীয় মনেতে সীতাকে বিশুদ্ধা বিবেচনা করিয়াই বননির্ঝরে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অপাপা পতিপরায়ণা শুদ্ধচারিণী,লোকাপবাদভীত তোমার নিকট প্রত্যয় প্রদান করিবেন। হে রাজনন্দন! যে হেতু তুমি তোমার এই প্রিয়তমাকে বিশুদ্ধা জানিয়াও লোকাপবাদ

পৃথক্২ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত

ভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছিলে, তজ্জন্যই দিব্যজ্ঞানে বিশুদ্ধা জানিয়াও আমি এই সরলাকে শপথার্থ আদেশ করিয়াছি।

রাম বাল্মীকি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া এবং সেই দেববর্ণিনী জনকীকে দেখিয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক জগৎস্থ জনগণের সমীপে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাই সত্য। হে ব্রহ্মন্! আপনার পবিত্র বাক্যেতেই আমার প্রত্যয় হইয়াছে, এবং বৈদেহীও লঙ্কামধ্যে পূর্ব্বকালে দেবগণ সমীপে প্রত্যয় প্রদান ও শপথ করিয়াছেন তজ্জন্যই আমি ইঁহাকে গৃহে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলাম। হে ব্রহ্মন্! এই জানকীকে আমি পবিত্রা জানিয়াও শুদ্ধ লোকাপবাদ ভয়ে ত্যাগ করিয়াছি। আর এই যমল কুশীলব আমারই পুত্র, আমি ত্যহা জানি; কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি যে কারণে জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি সেই লোকাপবাদ আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। জগন্মধ্যে পবিত্রা জানকীতে আমার প্রীতি থাকুক।

অনন্তর সীতাশপথ বিষয়ে রামের অভিপ্রায় জানিয়া দেবগণ ব্রহ্মাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সেই স্থলে সমাগত হইলেন এবং আদিত্যগণ বসুগণ রুদ্রগণ বিশ্বদেবগণ বায়ুগণ সকল সাধ্যগণ দেবগণ সকল পরমর্ষিগণ নাগ গণ পক্ষিগণ সিদ্ধগণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া সেস্থলে আগমন করিলেন। রাম সমাগত সেই সকল দেবগণ ঋষিগণকে দেখিয়া পুনর্ব্বার বাল্মীকিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পবিত্র ঋষিবাক্যে আমার প্রত্যয় আছে। জগতে বিশুদ্ধশালিনী সীতার প্রতি আমার প্রীতি থাকুক; কিন্তু সীতাশপথ দর্শনজন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সকলে সমাগত হইয়াছেন।

তখন দিব্য গন্ধবিশিষ্ট মনোহর এবং সর্ব্ব পাপ পুণ্য সাক্ষী পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইয়া সেই জনবৃন্দকে আহ্লাদিত করিল। পূর্ব্বকালে সত্যযুগের ন্যায় সেই আশ্চর্য্য অচিন্তনীয় ব্যাপার, সকল রাষ্ট্র হইতে সমাগত জনমণ্ডলী সমাহিত হইয়া দেখিতে লাগিল। কষায় বস্ত্র পরিধানা সীতা সকলকে

দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। একং খানি প্রস্তর পৃথক্ং করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটিং বৃক্ষ পৃথক্ং করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায়

সমাগত দেখিয়া অধোমুখী, অধোদৃষ্টি এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া এই রূপ কহিতে লাগিলেন। যদি আমি মনেতেও রাম ভিন্ন অন্য চিন্তা না করিয়া থাকি, তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামার্চ্চন করিয়া থাকি তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন। "আমি রাম ভিন্ন জানি না," আমার এই বাক্য যদি সত্য হয় তবে পৃথিবীদেবী আমাকে বিবর প্রদান করুন।

বৈদেহী এইরূপ শপথ করিলে, তখন অমিত বিক্রম দিব্য রত্নালঙ্কৃত নাগগণ কর্ত্তৃক মস্তকে বাহিত, দিব্যকান্তি, দিব্য সিংহাসন রসাতল হইতে সহসা আবির্ভূত হইল এবং সেই স্থলে পৃথিবীদেবী দুই বাহুদ্বারা সীতাকে গ্রহণ করিয়া এবং স্বাগত প্রশ্নে অভিনন্দন করিয়া সেই উত্তমাসনে উপবেশন করাইলেন।

সিংহাসনারূঢ়া সেই সীতাকে রসাতলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তদুপরি স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং দেব-গণের অতি বিপুল সাধুবাদ হঠাৎ উত্থিত হইল। সীতার রসা-তল প্রবেশ দেখিয়া অন্তরীক্ষ গত দেবগণ হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া, "সীতা সাধু সীতা সাধু যাঁহার এইরূপ চরিত্র" ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্য কহিতে লাগিলেন। যজ্ঞস্থলগত সেই সকল মুনিগণ ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ রাজগণ এই অদ্ভুত ঘটনাহেতু বিস্ময় হইতে বিরত হইতে পারিলেন না। তৎকালে আকাশে, ভূতলে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ, ও মহাকায় দানবগণ এবং পাতালে নাগ গণ সকলেই হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা হৃষ্টমনে শব্দ করিতে লাগিলেন; কাহারা বা ধ্যানস্থ হইলেন, কাহারাও বা রামকে দেখিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা নিঃসংজ্ঞ হইয়া সীতাকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমাগত সেই সকল ঋষি প্রভৃতির সীতার রসাতল প্রবেশ দেখিয়া এইপ্রকার সমাগম হইয়াছিল এবং সেই মুহূর্ত্তে সমুদায় জগৎ সমকালেই মোহিত হইয়াছিল।

না। এক একটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্ত্তির অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণন করা যায় না। কোটি কলস জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের। এস্থান ভাল রচনা, এইস্থান মন্দ রচনা, এইরূপ তাহার সর্ব্বাংশের পর্য্যালোচনা করিলে প্রকৃত গুণাগুণ বুঝিতে পারা যায় না। যেমত অট্টালিকার সৌন্দর্য্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে, তাহার অনন্তবিস্তার এক কালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনও সেইরূপ। মহাভারত এবং রামায়ণের অনেকাংশ এমন অপকৃষ্ট, যে তাহা কেহই পড়িতে পারে না। যে আণুবীক্ষণিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবে, সে কখনই এই দুই ইতিহাসের বিশেষ প্রশংসা করিবে না কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে বলিতে হইবে, যে এই দুই ইতিহাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কাব্য পৃথিবীতে বুঝি আর নাই।

সুতরাং উত্তরচরিত সম্বন্ধে মোটের উপর দুই চারিটা কথা না বলিলে নয়। অধিক বলিবার স্থান নাই।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অন্য অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই। কালিদাসের ঋতুসংহার, এবং টমসনের তদ্বিষয়ক কাব্যে, উৎকৃষ্ট বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা আছে। উভয় গ্রন্থই আদ্যোপান্ত সুমধুর, প্রসাদগুণ বিশিষ্ট, এবং স্বভাবানুকারী। তথাপি এই দুই কাব্য প্রধান কাব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে না—কেন না তদুভয় মধ্যে সৃষ্টিচাতুর্য্য কিছুই নাই।

সৃষ্টিক্ষমতা মাত্রই প্রশংসনীয় নহে। রেনল্ড্‌স্ নামক ইংরাজি আখ্যায়িকালেখকের রচনা মধ্যে নূতন সৃষ্টি অনেক

আছে। তথাপি ঐ সকলকে অতি অপকৃষ্ট গ্রন্থ মধ্যে গণনা করিতে হয়। কেন না সেই সকল সৃষ্টি স্বভাবানুকারিণী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্টা নহে। অতএব কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট না হইলে, কোন প্রশংসা নাই।

সৌন্দর্য্য এবং স্বভাবানুকারিতা, এই দুয়ের একটি গুণ থাকিলেই, কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয়গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না। আরব্য উপন্যাস বলিয়া যে বিখ্যাত আরব্য গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে, তল্লেখকের সৃষ্টির মনোহারিত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে স্বভাবানুকারিতা না থাকায় "আলেফ লয়লা" পৃথিবীর অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ মধ্যে গণ্য নহে।

কেবল স্বভাবানুকারিণী সৃষ্টিরও বিশেষ প্রশংসা নাই। যেমন জগতে দেখিয়া থাকি, কবির রচনা মধ্যে তাহারই অবিকল প্রতিকৃতি দেখিলে কবির চিত্রনৈপুণ্যে প্রশংসা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে চিত্রনৈপুণ্যেরই প্রশংসা, সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রশংসা কি? আর তাহাতে কি উপকার হইল? যাহা বাহিরে দেখিতেছি, তাহাই গ্রন্থে দেখিলাম; তাহাতে আমার লাভ হইল কি? যথার্থ প্রতিকৃতি দেখিয়া আমোদ আছে বটে—কেবল স্বভাবসঙ্গতি গুণবিশিষ্টা সৃষ্টিতে সেই আমোদ মাত্র জন্মিয়া থাকে। কিন্তু আমোদ ভিন্ন অন্য লাভ যে কাব্যে নাই, সে কাব্য সামান্য বলিয়া গণিতে হয়।

অনেকে এই কথা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ করিবেন। কি এ দেশে, কি সুসভ্য ইউরোপীয় জাতি মধ্যে, অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে (বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে) এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে

চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্ত উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য যাইতে পারে না।

যদি চিত্তরঞ্জনই কাব্যের উদ্দেশ্য হইল, তবে বেন্থামের তর্কে দোষ কি? * কাব্যেও চিত্তরঞ্জন হয়, শতরঞ্চ খেলায়ও চিত্তরঞ্জন হয়। বরং অনেকেরই ঐবান্‌হো অপেক্ষা একবাজি শতরঞ্চ খেলায় অধিক আমোদ হয়। তবে তাঁহাদের পক্ষে কাব্য হইতে শতরঞ্চ উৎকৃষ্ট বস্তু? এবং স্কট্ কালিদাসাদি অপেক্ষা একজন পাকা খেলোয়ার বড় লোক? অনেকে বলিবেন যে, কাব্যপ্রদত্ত আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ—সেই জন্য কাব্যের ও কবির প্রাধান্য। শতরঞ্চের আমোদ অবিশুদ্ধ কিসে?

এরূপ তর্ক যদি অযথার্থ না হয়,তবে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আর কিছু অবশ্য আছেই আছে। সেটি কি?

অনেকে উত্তর দিবেন, "নীতিশিক্ষা।" যদি তাহা সত্য হয়, তবে, "হিতোপদেশ" রঘুবংশ হইতে উৎকৃষ্ট কাব্য। কেন না বোধ হয়, হিতোপদেশে রঘুবংশ হইতে নীতি বাহুল্য আছে। সেই হিসাবে কথামালা হইতে শকুন্তলা কাব্যাংশে অপকৃষ্ট।

কেহই এ সকল কথা স্বীকার করিবেন না। যদি তাহা না করিলেন, তবে কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য কি? কি জন্য শতরঞ্চ খেলা ফেলিয়া শকুন্তলা পড়িব?

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যেরও সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের

* বেন্থাম বলেন, আমোদ সমান হইলে কাব্যের এবং 'পুশ্পিন্' খেলার একই দর।

শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিনির্ব্বাচনের দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

কথাটা পরিষ্কার হইল না। যদিও উত্তরচরিত সমালোচন পক্ষে এ কথা আর অধিক পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, তথাপি প্রস্তাবের গৌরবানুরোধে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হই-লাম।

চোর চুরি করে। রাজা তাহাকে বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না; আমি তাহা হইলে তোমাকে অবরুদ্ধ করিব।" চোর ভয়ে প্রকাশ্য চুরি হইতে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তাহার চিত্ত-শুদ্ধি জন্মিল না। সে যখনই বুঝিবে, চুরি করিলে রাজা জানিতে পারিবেন না, তখনই চুরি করিবে।

তাহাকে ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিও না—চুরি ঈশ্বরাজ্ঞাবিরুদ্ধ।" চোর বলিল, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যখন আমার আহারের অপ্রতুল করিয়াছেন, তখন আমি চুরি করিয়াই খাইব।" ধর্ম্মোপদেশক বলিলেন, "তুমি চুরি করিলে নরকে যাইবে।" চোর বলিল, "তদ্বিষয়ে প্রমাণা-ভাব।"

নীতিবেত্তা কহিতেছেন, "তুমি চুরি করিও না, কেননা চুরিতে সকল লোকের অনিষ্ট, যাহাতে সকল লোকের অনিষ্ট, তাহা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।" চোর বলিবে, "যদি সকল লোক আমার জন্য ভাবিত, আমি তাহা হইলে সকলের জন্য ভাবিতে পারিতাম। লোকে আমায় খেতে দিক্, আমি চুরি

করিব না। কিন্তু যে খানে লোকে আমায় কিছু দেয় না, সে খানে তাহাদের অনিষ্ট হয় হউক, আমি চুরি করিব।”

কবি চোরকে কিছু বলিলেন না, চুরি করিতে নিষেধ করিলেন না। কিন্তু তিনি এক সর্ব্বজনমনোহর পবিত্র চরিত্র সৃজন করিলেন। সর্ব্বজনমনোহর, তাহাতে চোরেরও মন মুগ্ধ হইবে। মনুষ্যের স্বভাব, যে যাহাতে মুগ্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ চিত্তপ্রীত হইয়া তদালোচনা করে। তাহাতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে —কেননা লাভাকাঙ্ক্ষার নামই অনুরাগ। এইরূপে পবিত্রতার প্রতি চোরের অনুরাগ জন্মে। সুতরাং চুরি প্রভৃতি অপবিত্র কার্য্যে সে বীতরাগ হয়।

“আত্মপরায়ণতা মন্দ—তুমি আত্মপরায়ণ হইও না।” এই নৈতিক উক্তি রামায়ণ নহে। কথাচ্ছলে এই নীতি প্রতিপন্ন করিবার জন্য রামায়ণের প্রণয়ন হয় নাই। কিন্তু রামায়ণ হইতে পৃথিবীর আত্মপরায়ণতা দোষ যতদূর পরিহার হইয়াছে, ততদূর, ঈশা এবং বুদ্ধ ভিন্ন কোন নীতিবেত্তা, ধর্ম্মবেত্তা, সমাজকর্ত্তা, বা রাজা বা রাজকর্ম্মচারীকর্ত্তৃক হয় নাই। সুবিবেচক পাঠকের এতক্ষণ বোধ হইয়া থাকিবেক, যে উদ্দেশ্য এবং সফলতা উভয় বিবেচনা করিলে, রাজা, রাজনীতিবেত্তা, ব্যবস্থাপক, সমাজতত্ত্ববেত্তা, ধর্ম্মোপদেষ্টা, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সর্ব্বাপেক্ষাই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কবিত্ব পক্ষে যেরূপ মানসিক ক্ষমতা আবশ্যক, তাহা বিবেচনা করিলেও কবির সেইরূপ প্রাধান্য। কবিরা জগতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা, এবং উপকারকর্ত্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মানসিকশক্তিসম্পন্ন।

কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে, তাহার সৃষ্টি দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে সে কি? সৌন্দর্য্য; অতএব

সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। সৌন্দর্য্য অর্থে কেবল বাহ্যপ্রকৃতির বা শারীরিক সৌন্দর্য্য নহে। সকল প্রকারের সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইবেক। যাহা স্বাভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এ জন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্য্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য্য দুইটি পৃথক্ গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্য্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।

আর একটি কথা বুঝাইলেই হয়। এই জগৎ ত সৌন্দর্য্যময়—তাহার প্রতিকৃতি মাত্রই সৌন্দর্য্যময় হইবে। তবে কেন আমরা উপরে বলিয়াছি যে, যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতি মাত্র সে সৃষ্টিতে কবির তাদৃশ গৌরব নাই? তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে "সৃষ্টি" বলা যায় না। যাহা সতের প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি। যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি। তাহাতেই চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। যাহা প্রাকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষ সংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট। কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন, এবং স্পষ্ট হইতে পারে।

এইরূপ যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি কবির সর্ব্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্য্য সৃষ্টিগুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি প্রধান। তৎপরেই মহাভারতকারের নাম নির্দ্দিষ্ট হইবে। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।

মহাভারতের পর, বোধ হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করিতে

হয়। তৎপরে শকুন্তলা। ভারতবর্ষের আর কোন কবিকে এ সম্বন্ধে অত্যুচ্চশ্রেণী মধ্যে গণা যাইতে পারে না।

এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়? তাহা তাঁহার তিনখানি নাটক পর্য্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্যও নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেক দূর পর্য্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব, এবং সৃষ্টিচাতুর্য্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে, যে রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতি মাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহচ্চিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। সীতাও তাঁহার কাছে, অপেক্ষাকৃত পরসাময়িক স্ত্রীলোকের চরিত্র কতকদূর পাইয়াছেন।

তাই বলিয়া এমত বলা যায় না যে, উত্তরচরিতে চরিত্র-সৃষ্টি-চাতুর্য্য কিছুই লক্ষিত হয় না। বাসন্তী ভবভূতির অভিনব সৃষ্টি বটে, এবং এ চরিত্র অত্যন্ত মনোহর। আমরা বাসন্তীর চরিত্রের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছি, সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর বিস্তারের আবশ্যক নাই। এই পরদুঃখকাতরহৃদয়া, স্নেহময়ী, বনচারিণী যে অবধি প্রথম দেখা দিলেন, সেই অবধিই তাঁহার প্রতি পাঠকের প্রীতি সঞ্চার হইতে থাকিল।

তদ্ভিন্ন চন্দ্রকেতু ও লবের চিত্রও প্রশংসনীয়। প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় ভবভূতিও জড়পদার্থকে রূপবান্ করণে বিলক্ষণ সুচতুর। তমসা, মুরলা, গঙ্গা, এবং পৃথিবী এই নাটকে

মানবরূপিণী। সেই রূপ গুলিন যে মনোহর হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

কবির সৃষ্টি—চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা কার্য্যাদিতে পরিণত হয়। ইহার মধ্যে কোন একটির সৃষ্টি কবির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। সকলের সংযোগে সৌর্য্যের সৃষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। চরিত্র, রূপ, স্থান, অবস্থা, কার্য্য, এ সকলের সমবায়ে যাহা দাঁড়াইল, তাহা যদি সুন্দর হইল, তবেই কবি সিদ্ধকাম হইলেন।

ভবভূতির চরিত্রসৃজনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছি। অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার সৃজনকৌশলের পরিচয় ছায়া নামে উত্তরচরিতের তৃতীয়াঙ্ক। আমাদিগের পরিশ্রম যদি নিষ্ফল না হইয়া থাকে, তবে পাঠক সেই ছায়ার মোহিনীশক্তি অনুভূত করিয়াছেন। ঈদৃশ রমণীয়া সৃষ্টি অতি দুর্লভ।

সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন। রসোদ্ভাবন কাহাকে বলে, আমরা বুঝাইতে বাসনা করি, কিন্তু রস শব্দটি ব্যবহার করিয়াই আমরা সে পথে কাঁটা দিয়াছি। এ দেশীয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদিগের, কেবল নিয়ম গুলিই অগ্রাহ্য এমত নহে, তাঁহাদিগের ব্যবহৃত শব্দ গুলিও পরিহার্য্য। ব্যবহার করিলেই বিপদ ঘটে। আমরা সাধ্যানুসারে তাহা বর্জ্জন করিয়াছি, কিন্তু এই রস শব্দটী ব্যবহার করিয়া বিপদ ঘটিল। নয়টি বৈ রস নয়, কিন্তু মনুষ্য চিত্তবৃত্তি অসংখ্য। রতি, শোক, ক্রোধ, স্থায়িভাব; কিন্তু হর্ষ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব। স্নেহ, প্রণয়, দয়া ইহাদের কোথাও স্থান নাই;—না স্থায়ী, না ব্যভিচারী—কিন্তু একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকারস্বরূপ স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে। স্নেহ, প্রণয়, দয়াদিপরি-

জ্ঞাপক রস নাই; কিন্তু শান্তি একটি রস। সুতরাং এবম্বিধ পারিভাষিক শব্দ লইয়া সমালোচনার কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমরা যাহা বলিতে চাহি, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলঙ্কারিকদিগকে প্রণাম করি।

মনুষ্যের কার্য্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্য্যের সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য। অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকেরা সেই বেগবতী মনোবৃত্তিগণকে "স্থায়ীভাব' নাম দিয়া এ শব্দের এরূপ পরিভাষা করিয়াছেন যে, প্রকৃত কথা বুঝা ভার। ইংরাজী আলঙ্কারিকেরা তাহাকে (Passions) বলেন। আমরা তাহার কাব্যগত প্রতিকৃতিকে রসোদ্ভাবন বলিলাম।

রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী মুখে স্নেহ উছলিতে থাকে—শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে। ভবভূতির মোহিনীশক্তিপ্রভাবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামের শরীর ভাঙ্গিতেছে; মর্ম্ম ছিঁড়িতেছে; মস্তক ঘুরিতেছে; চেতনা লুপ্ত হইতেছে—দেখিতে পাই, সীতা কখন বিস্ময়স্তিমিতা; কখন আনন্দোথিতা; কখন প্রেমাভিভূতা; কখন অভিমানকুণ্ঠিতা; কখন আত্মাবমাননা সঙ্কুচিতা; কখন অনুতাপবিবশা; কখন মহাশোকে ব্যাকুলা। কবি যখন যাহা দেখাইয়াছেন, একবারে নায়ক নায়িকার হৃদয় যেন বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন, যখন সীতা বলিলেন, "অম্মহে—জলভরিদমেহ থণিদগম্ভীর মংসলো কুদোণু এসো ভারদী নিগ্‌ঘোসো! ভরিজ্জমাণকণ্ণবিবরং মং বি মন্দভাইণিং ঝত্তি উস্মারেদি!" তখন বোধ হইল, জগৎসংসার

সীতার প্রেমে পরিপূর্ণ হইল। ফলে রসোদ্ভাবনী শক্তিতে ভবভূতি পৃথিবীর প্রধান কবিদিগের সহিত তুলনীয়। একটী মাত্র কথা বলিয়া মানবমনোবৃত্তির সমুদ্রবৎ সীমাশূন্যতা চিত্রিত করা, মহাকবির লক্ষণ। ভবভূতির রচনা সেই লক্ষণাক্রান্ত। পরিতাপের বিষয় এই যে, সে শক্তি থাকিতেও ভবভূতি রাম বিলাপের এত বাহুল্য করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার যশের লাঘব হইয়াছে।

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, এই রামবিলাপের সহিত, আর কয় খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কয়েকটি স্থান তুলিত করিয়া তারতম্য দেখাই। কিন্তু স্থানাভাবে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠক, শকুন্তলার জন্য দুষ্মন্তের বিলাপ, দেসদিমোনার জন্য ওথেলোর বিলাপ, এবং ইউরিপিদিসের নাটকে আল্‌কেস্তিষের জন্য আদ্‌মিতসের বিলাপ, এই রামবিলাপের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিবেন।

বাহ্য প্রকৃতির শোভার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ভবভূতির আর একটি গুণ। সংসারে যেখানে যাহা সুদৃশ্য, সুগন্ধ, বা সুখকর ভবভূতি অনবরত তাহার সন্ধানে ফিরেন। মালাকার যেমন পুষ্পোদ্যান হইতে সুন্দর২ কুসুমগুলি তুলিয়া সভামণ্ডল রঞ্জিত করে, ভবভূতি সেইরূপ সুন্দর বস্তু অবকীর্ণ করিয়া এই নাটক খানি শোভিত করিয়াছেন। যেখানে সুদৃশ্য বৃক্ষ, প্রফুল্লকুসুম, সুশীতল সুবাসিত বারি,—যেখানে নীল মেঘ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত, মৃদুনিনাদিনী নির্ঝরিণী, শ্যামল কানন, তরঙ্গসঙ্কুলা নদী—যেখানে সুন্দর বিহঙ্গ, ক্রীড়াশীল করিশাবক, সরলস্বভাব কুরঙ্গ—সেই খানে কবি দাঁড়াইয়া একবার তাহার সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে এই গুণটি সেক্ষপীয়র ও

কালিদাসের বিশেষ লক্ষণীয়। ভবভূতিরও সেই গুণ বিশেষ প্রকাশমান।

ভবভূতির ভাষা অতিচমৎকারিণী! তাঁহার রচনা সমাসবহুলতা ও দুর্ব্বোধ্যতা দোষে কলঙ্কিতা বলিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। সে নিন্দা সমূলক হইলেও সাধারণতঃ যে ভবভূতির ব্যবহৃত সংস্কৃত ও প্রাকৃত অতিমনোহর, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। উইলসন বলিয়াছেন যে, কালিদাস ও ভবভূতির ভাষার ন্যায় মহতী ভাষা কোন দেশের লেখকেই দৃষ্ট হয় না।

উত্তরচরিতের যে সকল দোষ, তাহা আমরা যথাস্থানে বিবৃত করিয়াছি—পুনরুল্লেখের আবশ্যক নাই। আমরা এই নাটকের সমালোচনা সমাপন করিলাম। অন্যান্য দোষের মধ্যে দৈর্ঘ্য দোষে এই সমালোচন বিশেষ দূষিত হইয়াছে। এজন্য আমরা কুণ্ঠিত নহি। যে দেশে তিন ছত্রে সচরাচর গ্রন্থসমালোচনা সমাপ্ত করা প্রথা, সে দেশে একখানি প্রাচীন গ্রন্থের সমালোচন দীর্ঘ হইলে দোষটি মার্জ্জনাতীত হইবে না। যদি ইহার দ্বারা একজন পাঠকেরও কাব্যানুরাগ বর্দ্ধিত হয়, বা তাঁহার কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তির কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, তাহা হইলেই এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমরা সফল বিবেচনা করিব।

গীতিকাব্য।*

কাব্য কাহাকে বলে, তাহা অনেকে বুঝাইবার জন্য যত্ন করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও যত্ন সফল হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে দুই ব্যক্তি কখন এক প্রকার অর্থ করেন নাই। কিন্তু কাব্যের যথার্থ লক্ষণ সম্বন্ধে, মতভেদ থাকিলেও কাব্য একই পদার্থ সন্দেহ নাই। সেই পদার্থ কি, তাহা কেহ বুঝাইতে পারুন বা না পারুন, কাব্যপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই এক প্রকার অনুভব করিতে পারেন।

কাব্যের লক্ষণ যাহাই হউক না কেন, আমাদিগের বিবেচনায় অনেকগুলিন গ্রন্থ, যাহার প্রতি সচরাচর কাব্য নাম প্রযুক্ত হয় না, তাহাও কাব্য। মহাভারত, রামায়ণ ইতিহাস বলিয়া খ্যাত হইলেও, তাহা কাব্য; শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইলেও তাহা কাব্য; স্কটের উপন্যাস গুলিকে আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্বীকার করি; নাটককে আমরা কাব্য মধ্যে গণ্য করি তাহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষীয় এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকেরা কাব্যকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অনেকগুলিন বিভাগ অনর্থক বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের কথিত তিনটী শ্রেণী গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হয়, যথা, ১ম, দৃশ্যকাব্য, অর্থাৎ নাটকাদি; ২য়, আখ্যান কাব্য অথবা মহাকাব্য; রঘুবংশের ন্যায় বংশাবলীর উপাখ্যান, রামায়ণের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের চরিত, শিশুপাল বধের ন্যায় ঘটনা বিশেষের বিবরণ, সকলই ইহার অন্তর্গত; বাসবদত্তা, কাদম্বরী, প্রভৃতি গদ্য কাব্য ইহার

---

* অবকাশরঞ্জিনী। কলিকাতা।

অন্তর্গত, এবং আধুনিক উপন্যাস সকল এই শ্রেণীভুক্ত। ৩য়, খণ্ড কাব্য। যে কোন কাব্য প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত নহে, তাহাকেই আমরা খণ্ড কাব্য বলিলাম।

দেখা যাইতেছে যে এই ত্রিবিধ কাব্যের রূপগত বিলক্ষণ বৈষম্য আছে। কিন্তু রূপগত বৈষম্য প্রকৃত বৈষম্য নহে। দৃশ্য-কাব্য সচরাচর কথোপকথনে রচিত হয়, এবং রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে; কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ এমত নহে। এদেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এই জন্য নিত্য দেখা যায়, যে কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত, এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে এক খানিও নাটক নহে। বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও নাটক নাই। পাশ্চাত্য ভাষায় অনেক গুলিন উৎকৃষ্ট কাব্য আছে, যাহা নাটকের ন্যায় কথোপকথনে গ্রন্থিত, কিন্তু বস্তুতঃ নাটক নহে। "Comus," "Manfred," "Faust," ইহার উদাহরণ। অনেকে শকুন্তলা, ও উত্তর রামচরিতকেও নাটক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, ইংরাজি ও গ্রীক ভাষা ভিন্ন কোন ভাষায় প্রকৃত নাটক নাই। এ কথা কতক দূর সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। পক্ষান্তরে গেটে বলিয়াছেন যে প্রকৃত নাটকের পক্ষে; কথোপকথনে গ্রন্থন, বা অভিনয়ের উপযোগিতা নিতান্ত আবশ্যক নহে। আমাদিগের বিবেচনায় "Bride of Lammer-moor" কে নাটক বলিলে নিতান্ত অন্যায় হয় না।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে আখ্যান কাব্যও নাটককারের প্রণীত হইতে পারে; অথবা গীত পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়া গীতিকাব্যের রূপ ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ভাষায়

শেষোক্ত বিষয়ের উদাহরণের অভাব নাই। পক্ষান্তরে, দেখা গিয়াছে অনেক খণ্ড কাব্য মহাকাব্যের আকারে রচিত হইয়াছে। যদি কোন একটি সামান্য উপাখ্যানের সূত্র গ্রন্থিত কাব্যমালাকে আখ্যান কাব্য বা মহাকাব্য নাম দেওয়া বিধেয় হয়, তবে "Excursion" এবং "Childe Harold" কে ঐ নাম দিতে হয়। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ঐ দুই কাব্য খণ্ড কাব্যের সংগ্রহ মাত্র।

খণ্ড কাব্য মধ্যে আমরা অনেক প্রকার কাব্যের স্থান করিয়াছি। তন্মধ্যে এক প্রকার কাব্য প্রাধান্য লাভ করিয়া ইউরোপে গীতিকাব্য (Lyric) নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্য সেই শ্রেণীর কাব্যের কথায় আমাদিগের প্রয়োজন।

ইউরোপে কোন বস্তু একটি পৃথক্ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, আমাদিগের দেশেও যে একটি পৃথক্ নাম দিতে হইবে এমত নহে। যেখানে বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই, সেখানে নামের পার্থক্য অনর্থক এবং অনিষ্টজনক। কিন্তু যেখানে বস্তুগুলি পৃথক্, সেখানে নামও পৃথক্ হওয়া আবশ্যক। যদি এমত কোন বস্তু থাকে যে তাহার জন্য গীতিকাব্য নামটি গ্রহণ করা আবশ্যক, তবে অবশ্য ইউরোপের নিকট আমাদিগকে ঋণী হইতে হইবে।

গীত মনুষ্যের এক প্রকার স্বভাবজাত। মনের ভাব কেবল কথায় ব্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা স্পষ্টীকৃত হয়। "আঃ" এই শব্দ কণ্ঠভঙ্গীর গুণে দুঃখবোধক হইতে পারে, বিরক্তিবাচক হইতে পারে, এবং ব্যঙ্গোক্তিও হইতে হইতে পারে। "তোমাকে না দেখিয়া আমি মরিলাম!" ইহা শুধু বলিলে, দুঃখ বুঝাইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত স্বরভঙ্গীর সহিত বলিলে দুঃখ শতগুণ অধিক বুঝাইবে। এই স্বরবৈচি-

ন্ত্রের পরিণামই সঙ্গীত। সুতরাং মনের বেগ প্রকাশের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত, মনুষ্য সঙ্গীতপ্রিয়, এবং তৎসাধনে স্বভাবতঃ যত্নশীল।

কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য ভিন্ন চিত্তভাব ব্যক্ত হয় না, অতএব সঙ্গীতের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ আবশ্যক। সেই সংযোগোৎপন্ন পদকে গীত বলা যায়।

গীতের জন্য বাক্যবিন্যাস করিলে দেখা যায়, যে কোন নিয়মাধীন বাক্যবিন্যাস করিলেই গীতের পারিপাট্য হয়। সেই সকল নিয়মগুলির পরিজ্ঞানেই ছন্দের সৃষ্টি।

গীতের পারিপাট্য জন্য আবশ্যক দুইটি, স্বরচাতুর্য্য এবং শব্দচাতুর্য্য। এই দুইটি পৃথক্২ দুইটি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। দুইটি ক্ষমতাই একজনের সচরাচর ঘটে না। যিনি সুকবি, তিনিই সুগায়ক, ইহা অতি বিরল।

কাজে কাজেই, একজন গীত রচনা করেন, আর একজন গান করেন। এইরূপে গীতহইতে গীতি কাব্যের পার্থক্য জন্মে। গীত হওয়াই গীতিকাব্যের আদিম উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন দেখা গেল যে গীত না হইলেও কেবল ছন্দোবিশিষ্ট রচনাই আনন্দদায়ক, এবং সম্পূর্ণ চিত্ত ভাবব্যঞ্জক, তখন গীতোদ্দেশ্য দূরে রহিল; অগেয় গীতিকাব্য রচিত হইতে লাগিল।

অতএব গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেম বাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায়

উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।

এই কবির বিশেষ গুণ এই যে চিত্তের যে সকল ভাব কোমল এবং স্নেহময়, তৎসমুদায় অপূর্ব্বশক্তি সহকারে উদ্ভূত করিতে পারেন। সেই অপূর্ব্ব শক্তিটি কি, তাহা আমরা সবিস্তারে বুঝাইব।

যখন হৃদয়, কোন বিশেষ ভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয় তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া এবং কথা নাটককারের সামগ্রী। যে টুকু অব্যক্ত থাকে, সেই টুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যে টুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয়, এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। অনেক নাটককর্ত্তা তাহা বুঝেন না, সুতরাং তাঁহাদিগের নায়ক নায়িকার চরিত্র অপ্রাকৃত এবং বাগাড়ম্বর বিশিষ্ট হইয়া উঠে। সত্য বটে, যে গীতিকাব্যলেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে; নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।

উদাহরণ ভিন্ন ইহা অনেকে বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু এ বিষয়ের একটি উত্তম উদাহরণ উত্তর চরিত সমালোচনায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সীতাবিসর্জ্জন কালে ও তৎপরে রামের

ব্যবহারে যে তারতম্য ভবভূতির নাটকে এবং বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, তাহার আলোচনা করিলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামের চিত্তে যখন যে ভাব উদয় হইতেছে, ভবভূতি তৎক্ষণাৎ তাহা লেখনী মুখে ধৃত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য উভয়ই তিনি স্বকৃত নাটক মধ্যগত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকোচিত কার্য্য না করিয়া গীতিকাব্যকারের অধিকারে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্মীকি তাহা না করিয়া কেবল রামের কার্য্য গুলিই বর্ণিত করিয়াছেন, এবং তত্তৎ কার্য্য সম্পাদনার্থ যতখানি ভাবব্যক্তি আবশ্যক, তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভবভূতিকৃত ঐ রাম বিলাপের সঙ্গে ডেসডিমোনা বধের পর ওথেলোর বিলাপের বিশেষ করিয়া তুলনা করিলেও এ কথা বুঝা যাইবে। সেক্ষপীয়র এমত কোন কথাই তৎকালে ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করেন নাই; যাহা তৎকালীন কার্য্যার্থ, বা অন্যের কথার উত্তরে ব্যক্ত করা প্রয়োজন হইতেছে না। ব্যক্তব্যের অতিরেকে তিনি এক রেখাও যান নাই। তিনি ভবভূতির ন্যায় নায়কের হৃদয়ানুসন্ধান করিয়া, ভিতর হইতে এক একটি ভাব টানিয়া আনিয়া, একে২ গণনা করিয়া, সারি দিয়া সাজান নাই। অথচ কে না বলিবে যে রামের মুখে যে দুঃখ ভবভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহস্র গুণ দুঃখ সেক্ষপীয়র ওথেলোর মুখে ব্যক্ত করাইয়াছেন।

সহজেই অনুমেয় যে যাহা ব্যক্তব্য তাহা পর সম্বন্ধীয়, বা কোন কার্য্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়; উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য। এরূপ কথা যে নাটকে একেবারে সন্নিবেশিত হইতে পারে না এমত নহে, বরং অনেক সময়ে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহা কখন নাটকের উদ্দেশ্য, হইতে

পারে না, নাটকের যাহা উদ্দেশ্য তাহার আনুষঙ্গিকতা বশতঃ প্রয়োজন মত কদাচিৎ সন্নিবেশিত হয়।

প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত।

কাব্য রসের সামগ্রী মনুষ্যের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তাহার সঞ্চালক তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে। কিন্তু কখনও কখনও মহাকবিরা, যাহা অতিমানুষ, তাহারও বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে অধিকাংশই মনুষ্যচরিত্রচিত্রের আনুষঙ্গিক মাত্র। মহাভারত, ইলিয়দ, প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যসকল, এই প্রকার পার্থিব নায়ক নায়িকার চিত্রানুষঙ্গিক দেবচরিত্র বর্ণনায় পরিপূর্ণ। দেবচরিত্র বর্ণনায় রসহানির বিশেষ কারণ এই যে যাহা মনুষ্য চরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না। যদি আমরা কোথাও পড়ি যে কোন মনুষ্য যমুনার এক বহুজলবিশিষ্ট হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হইয়া অজগর সর্প কর্ত্তৃক জলমধ্যে আক্রান্ত হইয়াছে, তবে আমাদিগের মনে ভয়সঞ্চার হয়; আমাদিগের জানা আছে যে এমন বিপদাপন্ন মনুষ্যের মৃত্যুরই সম্ভাবনা; অতএব তাহার মৃত্যুর আশঙ্কায় আমরা ভীত ও দুঃখিত হই; কবির অভিপ্রেত রস অবতারিত হয়, তাঁহার যত্নের সফলতা হয়। কিন্তু যদি আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিয়া থাকি, যে নিমগ্ন মনুষ্য বস্তুতঃ মনুষ্য নহে, দেবপ্রকৃত, জল বা সর্পের শক্তির অধীন নহে, ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্, তখন আর আমাদের ভয় বা কুতূহল থাকে না; কেন না

আমরা আগেই জানি যে এই অস্ত্রের, অবিনশ্বর পুরুষ এখনই কালিয় দমন করিয়া জল হইতে পুনরুত্থান করিবেন।

এমত অবস্থাতেও যে পূর্ব্বকবিগণ দৈব বা অতিমানুষ চরিত্র সৃষ্ট করিয়া লোকরঞ্জনে সক্ষম হইয়াছেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। তাঁহারা দেব চরিত্রকে মনুষ্য চরিত্রানুকৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; সুতরাং সে সকলের সঙ্গে পাঠক বা শ্রোতার সহৃদয়তার অভাব হয় না। মনুষ্যগণ যে সকল রাগদ্বেষাদির বশীভূত; মনুষ্য যে সকল সুখের অভিলাষী, দুঃখের অপ্রিয়; মনুষ্য যে সকল আশায় লুব্ধ, সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, অনুতাপে তপ্ত, এই মনুষ্যপ্রকৃত দেবতারাও তাই। শ্রীকৃষ্ণ, জগদীশ্বরের আংশিক বা সম্পূর্ণ অবতার স্বরূপ কল্পিত হইলেও মনুষ্যের ন্যায় ইন্দ্রিয়পর, মনুষ্যের ন্যায় প্রণয়শালী, ঐশ্বর্য্যলুব্ধ, বীরমদমত্ত, এবং চাতুর্য্যপ্রিয়। মানবচরিত্রগত এমন একটি মনোবৃত্তি নাই, যে তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। এই মানুষিক চরিত্রের উপর অতিমানুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে; কেন না কবি মানুষিক বল বুদ্ধি সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন। কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই; এবং তাহার নিয়ম এই যাহা প্রকৃত তাহা যে সকল নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।

সংস্কৃতে এক খানি এবং ইংরাজিতে এক খানি মহাকাব্য আছে যে দৈব এবং অতিপ্রকৃত চরিত্র তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় নহে। মূলবিষয়। আমরা কুমারসম্ভব এবং Parabise Lost নামক কাব্যের কথা বলিতেছি। মিল্‌টনের নায়ক দেব প্রকৃত ঈশ্বরবিদ্রোহী সয়তান, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ। জগদীশ্বরের সহিত তাহাদিগের বিবাদ, জগদীশ্বর এবং তাঁহার অনু-

চরের সহিত তাহাদিগের যুদ্ধ। মিল্‌টন কোন পক্ষকেই সম্যক্‌ প্রকারে মানবপ্রকৃতিবিশিষ্ট করেন নাই। সুতরাং তিনি কাব্য-রসের অত্যুৎকৃষ্ট অবতারণায় কৃতকার্য্য হইয়াও, লোক মনো-রঞ্জনে তাদৃশ কৃতকার্য্য হয়েন নাই। Paradise Lost অত্যুৎ-কৃষ্ট মহাকাব্য হইলেও, প্রায় কেহ তাহা আনুপূর্ব্বিক পাঠ করেন না। আনুপূর্ব্বিক পাঠ কষ্টকর হইয়া উঠে। মিল্‌টনের ন্যায় প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা না হইয়া যদি, ইহা মধ্যম শ্রেণীর কোন কবির রচনা হইত, তবে বোধ হয়, কেহই পড়িত না। ইহার কারণ মনুষ্য চরিত্রের অননুকারী দৈবচরিত্রে মনুষ্যের সহৃদয়তা হয় না। এই কাব্যে যেখানে আদম ও ইবের কথা আছে, সেইখানেই অধিকতর সুখদায়ক। কিন্তু ইহারা এ কাব্যের প্রকৃত নায়ক নায়িকা নহে—তাহাদের উল্লেখ আনু-ষঙ্গিক মাত্র। আদম ও ইব প্রকৃত মনুষ্যপ্রকৃত; তাহারা প্রথম মনুষ্য, পার্থিব সুখ দুঃখের অনধীন নিষ্পাপ, যে সকল শিক্ষার গুণে মনুষ্য মনুষ্য, সে সকল শিক্ষা পায় নাই। অতএব এই কাব্যে প্রকৃত মনুষ্য চরিত্র বর্ণিত হয় নাই।

কুমারসম্ভবে একটিও মনুষ্য নাই। যিনি প্রধান নায়ক, তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর। নায়িকা পরমেশ্বরী। তদ্ভিন্ন পর্ব্বত, পর্ব্বতমহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কাম, রতি ইত্যাদি দেব দেবী। বাস্তবিক এই কাব্যের তাৎপর্য্য অতি গূঢ়। সংসারে দুই সম্প্র-দায়ের লোক সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত বিবাদ করে দেখা যায়। এক, ইন্দ্রিয়পরবশ, ঐহিক সুখমাত্রাভিলাষী, পারত্রিক চিন্তা-বিরত; দ্বিতীয় বিষয়বিরত সাংসারিক সুখমাত্রের বিদ্বেষী, ঈশ্বর-চিন্তামগ্ন। এক সম্প্রদায়, কেবল শারীরিক সুখ সার করেন; আর এক সম্প্রদায় শারীরিক সুখের অনুচিত বিদ্বেষ করেন। বস্তুতঃ উভয় সম্প্রদায়ই ভ্রান্ত। যাঁহারা ঈশ্বরবাদী, ঈশ্বরপ্রদত্ত

ইন্দ্রিয় অমঙ্গলকর, বা অশ্রদ্ধেয় মনে করা তাঁহাদের অকর্ত্তব্য। শারীরিক ভোগাতিশয্যই দুষ্য; নচেৎ পরিমিত শারীরিক সুখ সংসারের নিয়ম, সংসাররক্ষার কারণ ঈশ্বরাদিষ্ট, এবং ধর্ম্মের পূর্ণতাজনক। এই শারীরিক এবং পারত্রিকের পরিণয় গীত করাই, কুমারসম্ভব কাব্যের উদ্দেশ্য। পার্থিব পর্ব্বতোৎপন্না উমা শরীররূপিণী, তপশ্চারী মহাদেব পারত্রিক শান্তির প্রতিমা। শান্তির প্রাপণাকাঙ্ক্ষায় উমা প্রথমে মদনের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল হইলেন। ইন্দ্রিয়সেবার দ্বারা শান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরিশেষে আপন চিত্ত বিশুদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়াসক্তি সমলতা চিত্ত হইতে দূর করিয়া, যখন শান্তির প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেন, তখনই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন। সাংসারিক সুখের জন্য আবশ্যক চিত্ত শুদ্ধি; চিত্তশুদ্ধি থাকিলে ঐহিক ও পারত্রিক পরস্পর বিরোধী নহে; পরস্পরে পরস্পরের সহায়।

এইরূপে কবি, মনোবৃত্তি প্রভৃতি লইয়া নায়ক নায়িকা গঠন করিয়া, লোকপ্রীত্যর্থ লৌকিক দেবতাদিগের নামে তাহা পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু দেবচিত্র প্রণয়নে তিনি মিল্‌টন্‌ অপেক্ষা অধিক কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। কবিত্ব ধরিতে গেলে, Paradise Lost হইতে কুমার সম্ভবকে বিশেষ ন্যূন বলিতে আমরা ইচ্ছুক নহি। আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব, কোন ভাষার কোন মহাকাব্যে আছে, কি না সন্দেহ। কিন্তু কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল কৌশলের কথা ধরিতে গেলে মিল্‌টন্‌ অপেক্ষা কালিদাসকে অধিক প্রশংসা করিতে হয়। Paradise Lost পাঠে শ্রম বোধ হয়; কুমারসম্ভব আদ্যোপান্ত পুনঃ২ পাঠ করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। ইহার কারণ এই যে কালিদাস

কয়েকটি দেবচরিত্র মনুষ্যচরিত্রানুকৃত করিয়া অশেষ মাধুর্য্য-বিশিষ্ট করিয়াছেন। উমা স্বয়ং আদ্যোপান্ত মানুষী, কোথাও তাঁহার দেবত্ব লক্ষিত হয় না। তাঁহার মাতা মেনা, মানুষী মাতার ন্যায়। "পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং" ইত্যাদি কবি-তার্দ্ধের সঙ্গে মণ্টাগুর উচ্চারিত "Like the bud bit by an envious worm" &c. ইতি উপমার তুলনা করুন। দেখিবেন, উমার মাতা এবং রোমিওর পিতা একই প্রকৃতি—হাড়েং মানব। মেনা পাষাণরাণী, কিন্তু কুলবতী মানবী দিগের ন্যায়, তাঁহার হৃদয় কুসুম সুকুমার।

বিদ্যাপতি ও জয়দেব।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতি কাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি—জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডী দাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতি-কাব্যপ্রণেতা আছেন; তাঁহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচজন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রস-মঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন, আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি "কবি-ওয়ালার" প্রাদুর্ভাব হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীত

এমত সুন্দর আছে, যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা, অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। (আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক জন অত্যুৎকৃষ্ট। হেম বাবুর গীতিকাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে, যে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনা রহিত।)

সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অসংখ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্ঝটিকা রূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্য্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই। কোম্‌ৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে, যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকার ভেদ, সমাজবিপ্লবের প্রকার ভেদ, ধর্ম্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকার ভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে। কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের আভ্যন্তরিক সম্বন্ধ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বকল ভিন্ন কেহ বিশেষ রূপে পরিশ্রম করেন নাই, এবং হিতবাদ মতপ্রিয় বক্লের সঙ্গে কাব্য সাহিত্যের সম্বন্ধ কিছু অল্প। মনুষ্যচরিত্র হইতে ধর্ম্ম

এবং নীতি মুছিয়া দিয়া, তিনি সমাজতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত। বিদেশ সম্বন্ধে যাহা হউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ তত্ত্ব কেহ কখন উত্থাপন করিয়াছিলেন এমত আমাদের স্মরণ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে মক্ষমূলরের গ্রন্থ বহুমূল্য বটে, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের সঙ্গে সে গ্রন্থের সামান্য সম্বন্ধ।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের প্রকৃত গতি কি? তাহা জানি না, কিন্তু তাহার গোটাকত স্থূল স্থূল চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রথম ভারতীয় আর্য্যগণ অনার্য্য আদিম বাসীদিগের সহিত বিবাদে ব্যস্ত; তখন ভারতবর্ষীয়েরা অনার্য্যকুলপ্রমথনকারী, ভীতিশূন্য, দিগন্তবিচারী, বিজয়ী বীর জাতি। সেই জাতীয় চরিত্রের ফল রামায়ণ। তারপর ভারতবর্ষের, অনার্য্য শত্রু সকল ক্রমে বিজিত, এবং দূরপ্রস্থিত; ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য এবং মহা সমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট, হস্তগত অনন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে, তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে—অন্য শত্রুর অভাবে সেই পৌরুষ পরস্পরের দমনার্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের কাব্য মহাভারত। বল যাহার, ভারত তাহার হইল। বহু কালের রক্তবৃষ্টি শমিত হইল। স্থির হইয়া, উন্নতপ্রকৃতি আর্য্যকুল শান্তিসুখে মন দিলেন। দেশের ধন বৃদ্ধি, শ্রী বৃদ্ধি, ও সভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোমক হইতে যবদ্বীপ ও চৈনিক পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য ছুটিতে লাগিল; প্রতি নদীকূলে অনন্তসৌধমালাশোভিত মহানগরী সকল মস্তক উত্তোলন করিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়েরা সুখী হইলেন। সুখী এবং কৃতী। এই সুখ ও কৃতিত্বের ফল, কালিদাসাদির

নাটক ও মহাকাব্য সকল। কিন্তু লক্ষ্মী বা সরস্বতী কোথাও চিরস্থায়িনী নহেন; উভয়েই চঞ্চলা। ভারতবর্ষ ধর্ম্ম শৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল, যে সাহিত্যরস-গ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূতা হইল। প্রকৃতাপ্রকৃত বোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্ম্মানুকারী হইল। কেবল তাহাই নহে, বিচার শক্তি ধর্ম্ম মোহে বিকৃত হইয়াছিল—প্রকৃত ত্যাগ করিয়া অপ্রকৃত কামনা করিতে লাগিল। ধর্ম্মই তৃষ্ণা, ধর্ম্মই আলোচনা, ধর্ম্মই সাহিত্যের বিষয়। এই ধর্ম্মমোহের ফল পুরাণ।

ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপনা করিয়াছিলেন, যে তথাকার জল বায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজোলুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না, এবং উর্ব্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য। সেখানে আসিয়া আর্য্যতেজঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্য্য প্রকৃতি কোমলতাময়ী, আলস্যের বশবর্ত্তিনী, এবং গৃহ সুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, যে আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতা পূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতী প্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতি চরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য গীতিকাব্যের এত বাহুল্য।

বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে

পারে। একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর একদল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্যপ্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর এক দল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য চরিত্র খণিতে যে রত্ন মিলে, তাহার দীপ্তির জন্য অন্য দীপের আবশ্যক নাই, বিবেচনা করেন। প্রথম শ্রেণীর প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীর মুখপাত্র বিদ্যাপতি। জয়দেবাদির কবিতায়, সতত মাধবী যামিনী, মলয়সমীর, ললিতলতা, কুবলয়-দল শ্রেণী, স্ফুটিত কুসুম, শরচ্চন্দ্র, মধুকরবৃন্দ, কোকিলকূজিত কুঞ্জ, নবজলধর, এবং তৎসঙ্গে, কামিনীর মুখমণ্ডল ভ্রবল্লী, বাহুলতা বিম্বোষ্ঠ, সরসীরুহলোচন, অলসনিমেষ, এই সকলের চিত্র, বাতোন্মথিত তটিনীতরঙ্গবৎ সতত চাকচিক্য সম্পাদন করিতেছে। বাস্তবিক এই শ্রেণীর কবিদের কবিতায় বাহ্য প্রকৃতির প্রাধান্য। বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই এমত নহে—বাহ্য প্রকৃতির সঙ্গে মানব হৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ সুতরাং কাব্যেরও নিত্য সম্বন্ধ, কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎপরিবর্ত্তে মনুষ্য হৃদয়ের গূঢ় তল-চারী ভাব সকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে। জয়দেবাদিতে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতি প্রভৃতিতে অন্তঃপ্রকৃতির রাজ্য। জয়দেব, বিদ্যাপতি উভয়েই রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কথা গীত করেন। কিন্তু জয়দেব যে প্রণয় গীত করিয়াছেন, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের অনুগামী। বিদ্যাপতির কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডী-দাসাদির কবিতা বহিরিন্দ্রিয়ের অতীত। তাহার কারণ কেবল

এই বাহ্যপ্রকৃতির শক্তি। স্থূল প্রকৃতির সঙ্গে স্থূল শরীরেরই নিকট সম্বন্ধ, তাহার আধিক্যে কবিতা একটু ইন্দ্রিয়ানুসারিণী হইয়া পড়ে। বিদ্যাপতির দল মনুষ্য হৃদয়কে বহিঃপ্রকৃতি ছাড়া করিয়া, কেবল তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন, সুতরাং তাঁহার কবিতা, ইন্দ্রিয়ের সংশ্রব শূন্য, বিলাস শূন্য, পবিত্র হইয়া উঠে। জয়দেবের গীত, রাধাকৃষ্ণের বিলাস পূর্ণ; বিদ্যাপতির গীত রাধাকৃষ্ণের প্রণয় পূর্ণ। জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি, আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা। জয়দেবের কবিতা, উৎফুল্লকমল-জালশোভিত, বিহঙ্গমাকুল, স্বচ্ছ বারিবিশিষ্ট সুন্দর সরোবর; বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী। জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা। জয়দেবের গান, মুরজবীণাসঙ্গিনী স্ত্রীকণ্ঠগীতি; বিদ্যাপতির গান, সায়াহ্ন সমীরণের নিশ্বাস।

আমরা জয়দেব ও বিদ্যাপতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাঁহাদিগকে এক এক ভিন্নশ্রেণীর গীতিকবির আদর্শস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাহা বলিয়াছি। যাহা জয়দেব সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ত্তে, যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা গোবিন্দদাস চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে তদ্রূপই বর্ত্তে।

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্য লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা বৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন। পূর্ব্ব কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনার নিকটবর্ত্তী যাহা তাহা চিনিতেন। যাহা আভ্যন্তরিক,

বা নিকটস্থ, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহার অননুকরণীয় চিত্র সকল রাখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে। তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূরসম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ প্রকাশিকা হইয়াছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণ কূপে গভীর; তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।

(মানস বিকাশ এই কথা প্রমাণ করিতেছে। আমরা মানস বিকাশ পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি—"মিলন" ও "কাল" নামক দুইটি কবিতা উৎকৃষ্ট। "কাল" হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত ছটায় ধাইল হরষে,
ভুবনময়,
নর নারী কীট পতঙ্গ সহিত
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত
গ্রহ উপগ্রহ হইল শোভিত
হলো উদয়।

তখন ত কাল প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিতে সকলে আপন অধীনে
সব সময়॥
দুরন্ত দংশন কালরে তোমার,
তব হাতে কারও নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি কর না বিচার,
বধ সকলে।
রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখ নীরে কর নিমগন,
পদযুগে পরে কররে দলন,
আপন বলে॥
সুখের আগারে বিষাদ আনিয়া
কতশত নরে যাও ভাসাইয়া,
নয়নজলে।

এ কবিতা উত্তম, কিন্তু ইহাতে বড় ইংরেজি ইংরেজি গন্ধ কয়। প্রাচীন বাঙ্গালি গীতিকাব্য লেখকেরা এ পথে যাইতেন না; কালের কথা গায়িতে গেলে, সৃষ্টির আদি, রাজেন্দ্রের মুকুট, সমগ্র মনুষ্য জাতির নয়নজল তাঁহাদিগের মনে পড়িত না; এসকল জ্ঞান ও বুদ্ধি বিস্তৃতির ফল। প্রাচীন কবি, কালের গতি ভাবিতে গেলে, আপনার হৃদয়ই ভাবিতেন; নিজ হৃদয়ে কালের "দুরন্ত দংশন" কি প্রকার, তাহার বিষ কেমন, তাহাই দেখিতেন। কাল সম্বন্ধে একটি প্রাচীন কবিতা তুলনার জন্য আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

এখন তখন করি, দিবস গোয়াঙলু
দিবস দিবস করি মাসা।

মাস মাস করি, বরিখ গোয়াওনু
খোয়ানু এ তনুয়াক আশা॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোয়াওনু
খোয়াওনু এ তনু আশে।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধবি মাসে॥
অঙ্কুর তপন তাপে তনু যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব সোপিয়া লেহে॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, ইত্যাদি।

কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তাহা অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি, ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে এক দিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাশক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে আনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি। ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, কালিদাস ও জয়দেব। আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ, পোপ ও জন্সন।

ভারতচন্দ্রাদি বাঙ্গালি কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য ইন্দ্রিয়পর। কোন মূর্খ না মনে

করেন, যে ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে—কেবল কাব্যের শ্রেণী নির্ব্বাচন হইতেছে মাত্র। আধুনিক, ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালি কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, যেরূপ ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, তেমনি কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিক দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র, নিজের প্রতিভা শক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিকতা দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট; কিন্তু অবকাশরঞ্জিনীর লেখক, এবং মানস বিকাশ লেখকের এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল। নিম্নশ্রেণীর কবিদিগের মধ্যেও ইহা প্রবল। যাঁহারা নিত্য পয়ার রচনা করিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেছেন, তাঁহারা যেন না মনে করেন, তাঁহাদিগের প্রতি আমরা এ দোষ আরোপিত করিতেছি; অন্তঃপ্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতি কোন প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের কোন দোষই নাই।

মানস বিকাশের কবিতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা "মিলন" কিন্তু তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে তাহার উৎকর্ষ অনুভূত করা যায় না। তাহা কর্ত্তব্য নহে, এবং তদুপযুক্ত স্থানও আমাদিগের নাই। এজন্য "প্রেম প্রতিমা" হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

আইল বসন্ত বিজন কাননে,
অমনি তখনি সহাস্য বদনে,
তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায়,
তুমিও যেখানে কর পদার্পণ,
সুধচন্দ্র তথা বিতরে কিরণ,

বিষাদ, হুতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায়।
তব আবির্ভাবে, ভুবন মোহিনি,
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী,
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি
ধরণী তলে,
আঁধার আকাশে হিমাংশু কিরণ
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন, মরি অখিল ভুবন,
সুখ সলিলে॥
কে বলে কেবল নন্দন কাননে,
ফোটে পারিজাত? ফোটেনা এখানে
দেখ চেয়ে এই সংসার কাননে
ফুটেছে কত!
গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে,
রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে,
কতশত ফুল প্রফুল্ল বদনে
ফোটে নিয়ত।

ইংরেজ শিষ্য, এইরূপে প্রেম বর্ণন করিলেন, ইহার সঙ্গে কণ্ঠীধারী বৈরাগিগণ কৃত প্রেমবর্ণন তুলনা করুন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আর একজন হাফ ইংরেজ হাফ জয়দেব চেলার কৃত কবিতা শুনুন; এ কবিতারও উদ্দেশ্য প্রেমোচ্ছ্বাস বর্ণনা।

"মানস সরসে সখি ভাসিছে মরালরে
কমল কাননে।
কমলিনী কোন ছলে, ডুবিয়া থাকিবে জলে,
বঞ্চিয়া রমণে।

যে যাহারে ভাল বাসে, সে যাইবে তার পাশে,
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে।
যদি অবহেলা করি, রুষিবে সম্বর-অরি,
কে সম্বরে স্মরশরে, এ তিন ভুবনে॥
ওই শুন পুন বাজে মজাইয়া মনরে
মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কানে
আমি শ্যামদাসী।
জলদ গরজে যবে, ময়ূরী নাচে সে রবে,
আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁশী?
সৌদামিনী ঘন সনে, নাচে সদানন্দ মনে
রাধিকা কেন ত্যজিবে রাধিকা বিলাসী॥

* * * *

সাগর উদ্দেশে নদী ভ্রমে দেশে দেশে রে
অবিরাম গতি!
গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,
নিশি রূপবতী॥
আমার প্রেম সাগর, দুয়ারে মোর নাগর,
তারে ছেড়ে রব আমি? ধিক্ এ কুমতি!
আমার সুধাংশু নিধি, আমারে দিয়াছে বিধি,
বিরহ-আঁধারে আমি? ধিক্ এ যুকতি!"

এক্ষণে বৈষ্ণবের দলের দুই একটা গীত—

সই, কি না সে বঁধুর প্রেম।
আঁখি পালটিতে নহে পরতীতে
যেন দরিদ্রের হেম॥

হিয়ায় হিয়ায়, লাগিবে লাগিয়ে,
চন্দন না মাখে অঙ্গে।
গায়ের ছায়া, বাইয়ের দোসর,
সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥
তিলে কত বেরি, মুখ নিহারয়ে,
আঁচরে মোছয়ে ঘাম।
কোরে থাকিতে কত দূর মানয়ে,
তেঁই সদাই নয় নাম॥
জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে
রসের পসরা কাছে।
জ্ঞানদাস কহে, এমতি পীরিতি,
আর কি জগতে আছে॥

পুনশ্চ,

সোই পীরিতি পিয়া সে জানে।
যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি,
নিছনি দিবে পরাণে॥
মো যদি সিনান, আগিলা ঘাটে,
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়ে,
বাহু পশারিয়া রয়॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়ে
একই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়ে নেয়॥
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়ে
ফিরয়ে কতেক পাকে॥

আমার অঙ্গের বাতাস, যেদিকে যেদিন
সেদিকে সেদিন থাকে ॥
মনের আকুতি বেকত* করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে ॥

পরিশেষে আমাদের গীতিকাব্যের আদিপুরুষ, এ শ্রেণীর সকল কবির আদর্শ, জয়দেব গোস্বামীর একটি গীত উদ্ধৃত করিব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জয়দেব যেমন সুকবি, তেমনি রসিক— তাঁহার কবিতার রস বড় গাঢ়। তবে যাত্রাকর দিগের কৃপায়, অনেকে তাঁহার দুই একটি গীত, বুঝুন না বুঝুন, শুনিয়া রাখিয়াছেন! যাঁহারা বুঝিয়াছেন, বা গীত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জয়দেবের একটি গীত স্মরণ করুন—"বদসি যদি কিঞ্চিদপি" ইত্যাদি গীত স্মরণ করিলেও চলিবে। এই কয়টি কবিতা তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিবেন,

প্রথম, জয়দেবে বহিঃপ্রকৃতি ভক্তি ইন্দ্রিয় পরতায় দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয়, জ্ঞানদাস ও রায় শেখরে বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতির পশ্চাদ্বর্ত্তিনী এবং সহচরী মাত্র। আর কবিতার গতি অতি সঙ্কীর্ণ পথে—নিকট সম্বন্ধ ছাড়িয়া দূর সম্বন্ধ বুঝাইতে চায় না—কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ পথে গতি অত্যন্ত বেগবতী।

তৃতীয়, মধুসূদনের কবিতার, সেই গতি পরিসরপথবর্ত্তিনী হইয়াছে—দূর সম্বন্ধে ব্যক্ত করিতে শিখিয়াছে—কিন্তু কবিতার আর সে পাষাণভেদিনী শক্তি নাই। নদীর স্রোতের ন্যায়, বিস্তৃতিতে যাহা লাভ হইয়াছে, বেগে তাহার ক্ষতি হইয়াছে।

চতুর্থ, মানস বিকাশে, আধ্যাত্মিকতা দোষ ঘটিয়াছে।)

---

* ব্যক্ত।

আর্য্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প। *

একদল মনুষ্য বলেন, যে এ সংসারে সুখ নাই, বনে চল, ভোগাভোগ সমাপ্ত করিয়া মুক্তি বা নির্ব্বাণ লাভ কর। আর একদল বলেন, সংসার সুখময়, বঞ্চকের বঞ্চনা অগ্রাহ্য করিয়া, খাও, দাও, ঘুমাও। যাঁহারা, সুখাভিলাষী তাঁহাদিগের মধ্যে নানা মত। কেহ বলেন ধনে সুখ, কেহ বলেন মনে সুখ; কেহ বলেন ধর্ম্মে, কেহ বলেন অধর্ম্মে; কাহার সুখ কার্য্যে, কাহারও সুখ জ্ঞানে। কিন্তু প্রায় এমন মনুষ্য দেখা যায় না, যে সৌন্দর্য্যে সুখী নহে। তুমি সুন্দরী স্ত্রীর কামনা কর; সুন্দরী কন্যার মুখ দেখিয়া প্রীত হও; সুন্দর শিশুর প্রতি চাহিয়া বিমুগ্ধ হও, সুন্দরী পুত্রবধূর জন্য দেশ মাথায় কর। সুন্দর ফুলগুলি বাছিয়া শয্যায় রাখ, ঘর্ম্মাক্ত ললাটে যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছ, সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, সুন্দর উপকরণে সাজাইতে, তাহা ব্যয়িত করিয়া ঋণী হও; আপনি সুন্দর সাজিবে বলিয়া, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, সুন্দর সজ্জা খুঁজিয়া বেড়াও —ঘটী বাটী পিত্তল কাঁশাও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার যত্ন কর। সুন্দর দেখিয়া পাখী পোষ, সুন্দর বৃক্ষে সুন্দর উদ্যান রচনা কর, সুন্দর মুখে সুন্দর হাসি দেখিবার জন্য, সুন্দর কাঞ্চন রত্নে সুন্দরীকে সাজাও। সকলেই অহরহ সৌন্দর্য্যতৃষায় পীড়িত কিন্তু কেহ কখন এ কথা মনে করে না বলিয়াই এত বিস্তারে বলিতেছি।

এই সৌন্দর্য্য তৃষা যেরূপ বলবতী, সেইরূপ প্রশংসনীয়

---

* সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্য্যজাতির শিল্পচাতুরি, শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমাণি প্রণীত। কলিকাতা। ১৯৩০।

এবং পরিপোষয়িতা। মনুষ্যের যত প্রকার সুখ আছে তন্মধ্যে এই সুখ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কেন না, প্রথমতঃ ইহা পবিত্র, নির্ম্মল, পাপ সংস্পর্শশূন্য; সৌন্দর্য্যের উপভোগ কেবল মানসিক সুখ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইহার সংস্পর্শ নাই। সত্য বটে, সুন্দর বস্তু, অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট; কিন্তু সৌন্দর্য্য জনিত সুখ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হইতে ভিন্ন। রত্নখচিত সুবর্ণ জলপাত্রে জলপানে তোমার যেরূপ তৃষা নিবারণ হইবে, কুগঠন মৃৎপাত্রেও তৃষা নিবারণ সেইরূপ হইবে; স্বর্ণপাত্রে জলপান করায় যে টুকু অতিরিক্ত সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মানসিক সুখ। আপনার স্বর্ণপাত্রে জল খাইলে অহঙ্কারজনিত সুখ তাহার সঙ্গে মিশে বটে, কিন্তু পরের স্বর্ণপাত্রে জলপান করিয়া তৃষা নিবারণাতিরিক্ত যে সুখ, তাহা সৌন্দর্য্যজনিত মাত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তীব্রতায় এই সুখ সর্ব্বসুখাপেক্ষা গুরুতর; যাঁহারা নৈসর্গিক শোভাদর্শন প্রিয়, বা কাব্যামোদী, তাঁহারা ইহার অনেক উদাহরণ মনে করিতে পারিবেন; সৌন্দর্য্যের উপভোগজনিত সুখ, অনেক সময়ে তীব্রতায় অসহ্য হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, অন্যান্য সুখ, পৌনঃপুন্যে অপ্রীতিকর হইয়া উঠে, সৌন্দর্য্যজনিত সুখ, চির নূতন, এবং চিরপ্রীতিকর।

অতএব যাঁহারা মনুষ্যজাতির এই সুখবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা মনুষ্যজাতির উপকারকদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ পদ প্রাপ্তির যোগ্য। যে ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া নেড়ার গীত গাইয়া মুষ্টিভিক্ষা লইয়া যায়, তাহাকে কেহ মনুষ্যজাতির মহোপকারী বলিয়া স্বীকার করিবে না বটে, কিন্তু যে বাল্মীকি, চিরকালের জন্য কোটি কোটি মনুষ্যের অক্ষয় সুখ এবং চিত্তোৎকর্ষের উপায় বিধান করিয়াছেন, তিনি যশের মন্দিরে নিউটন, হার্বি, ওয়াট,

বা জেনরের অপেক্ষা নিম্ন স্থান পাইবার যোগ্য নহেন। অনেকে লেকি, মেকলে, প্রভৃতি অসারগ্রাহী লেখকদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া কবির অপেক্ষা পাতুকাকারকে উপকারী বলিয়া উচ্চাসনে বসান; এই গুড়মূর্খ দলের মধ্যে আধুনিক অর্দ্ধ-শিক্ষিত বাঙ্গালি বাবু অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের রাজপুরুষ চূড়ামণি গ্লাডষ্টোন, স্কটলণ্ডজাত মনুষ্যদিগের মধ্যে, হিউম্, আদম স্মিথ হণ্টর, কর্লাইল থাকিতে ওয়ল্টর স্কটকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছেন।

যেমন মনুষ্যের অন্যান্য অভাব পূরণার্থ এক একটি শিল্প বিদ্যা আছে, সৌন্দর্য্যাকাঙ্ক্ষা পূরণার্থও বিদ্যা আছে। সৌন্দর্য্য স্বজনের বিবিধ উপায় আছে। উপায় ভেদে, সেই বিদ্যা পৃথক্ পৃথক্ রূপ ধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল সুন্দর বস্তু দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কতক-গুলির, কেবল বর্ণ মাত্র আছে—আর কিছু নাই। যথা আকাশ।

আর কতকগুলির বর্ণ ভিন্ন, আকারও আছে, যথা পুষ্প।

কতকগুলির, বর্ণ, ও আকার ভিন্ন, গতিও আছে, যথা উরগ।

কতকগুলির বর্ণ, আকার, গতি ভিন্ন, রব আছে; যথা কোকিল।

মনুষ্যের, বর্ণ, আকার, গতি, ও রব ব্যতীত অর্থযুক্ত বাক্য আছে।

অতএব সৌন্দর্য্য স্বজনের জন্য, এই কয়টি সামগ্রী, বর্ণ, আকার, গতি, রব, ও অর্থযুক্ত বাক্য।

যে সৌন্দর্য্যজননী বিদ্যার বর্ণ মাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্র বিদ্যা কহে।

যে বিদ্যার অবলম্বন, আকার তাহা দ্বিবিধ। জড়ের

আকৃতিসৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য। চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য্য।

যে সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

রব, যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।

কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, এবং চিত্র, এই ছয়টি সৌন্দর্য্যজনিকা বিদ্যা। ইউরোপে এই সকল বিদ্যার যে জাতিবাচক নাম প্রচলিত আছে, শ্রীমাণি বাবু তাহার অনুবাদ করিয়া "সূক্ষ্মশিল্প" নাম দিয়াছেন। (নামটি আমাদের প্রীতিকর হয় নাই। যদি কালিদাস প্রেতাবস্থায় শুনিতে পান যে কুমারসম্ভব, শকুন্তলা রচনা, "শিল্প" বিদ্যা মাত্র, তবে তিনি রাগ করিবেন সন্দেহ নাই, এবং যে শিল্পবিদ্যার প্রভাবে ইলোরার প্রকাণ্ড গুহাট্টালিকা খোদিত হইয়াছিল, তাহাকে "সূক্ষ্ম" বলা একটু অসঙ্গত হয়। যাহা হউক, নামে কিছু আসিয়া যায় না।

কাব্যের সঙ্গে, অন্যান্য "সূক্ষ্মশিল্পের," এত প্রকৃতিগত বিভেদ, যে এক্ষণে, অনেকেই ইহাকে আর "সূক্ষ্মশিল্প" মধ্যে গণ্য করেন না; নৃত্য গীত, সামাজিক সামগ্রী, একা বিদ্বানের নহে, সুতরাং উঁহাও একটু তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে এবং "সূক্ষ্ম শিল্প" নাম করিলে, আপাততঃ চিত্র, ভাস্কর্য্য, এবং স্থাপত্যই মনে পড়ে। বাবু শ্যামাচরণ শ্রীমাণির গ্রন্থের বিষয়, কেবল এই তিন বিদ্যা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে, এই তিন বিদ্যার কিরূপ প্রচার এবং উন্নতি ছিল, তাহার পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কিন্তু গ্রন্থারম্ভে, সাধারণতঃ সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি বিষয়ক একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি পাঠযোগ্য।

তৎপরে গ্রন্থকার, অস্মদ্দেশীয় শিল্পকার্য্যের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এ দেশের শিল্পকার্য্য যে প্রাচীন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, কিন্তু শ্রীমাণি বাবু ইহার যেরূপ প্রাচীনতা প্রতিজ্ঞাত করিয়াছেন, সেরূপ প্রাচীনতা প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। অশোকের পূর্ব্বকালিক স্থাপত্য বিদ্যার কোন চিহ্ন এ দেশে যে বর্ত্তমান নাই, তাহা আপাততঃ স্বীকার করিতে হইবে।

এই গ্রন্থে প্রাচীন আর্য্যগণের স্থাপত্য বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাই ইহার উৎকৃষ্টাংশ; তাহা পাঠ করিয়া ভারতবর্ষীয় মাত্রেই প্রীতিলাভ করিবেন। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা পৃথিবীর কোন জাতির অপেক্ষায় স্থাপত্য দক্ষতায় ন্যূন ছিলেন না। ভারতবর্ষীয়েরা, কাব্য, দর্শন, গণিত প্রভৃতি নানা বিদ্যায় প্রাধান্যলাভ করিয়া ছিলেন, কিন্তু স্থাপত্যে যেরূপ তাঁহাদিগের প্রাধান্য প্রতিবাদের অতীত, বোধ হয়, সেরূপ আর কোন বিদ্যায় নহে। ফর্গুসন সাহেবের যে কয়টি কথা শ্রীমাণি বাবু উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরাও তাহা পুনরুদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি বলেন, যে—

"ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ও ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য জাতীয় স্থাপত্য হইতে এত পৃথক্ যে, মিথ্যা ও ভ্রমাত্মক সংস্কারোৎপত্তির আশঙ্কা না করিয়া ইহার সহিত কোন জাতীয় স্থাপত্যের তুলনা করা যাইতে পারে না। * * * ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বহ্বায়াস-সাধ্য-গঠননৈপুণ্য ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। ইহার অলঙ্কার প্রাচুর্য্যই আশ্চর্য্য ভাব উদ্দীপক এবং ইহার ক্ষুদ্রক্ষুদ্র গঠনগুলির ভিন্ন অংশ সকলের সৌন্দর্য্য ও মাধুরি এবং প্রধান

গঠনটীর সহিত সে সকলের উপযোগিতা, সর্ব্বস্থলেই দর্শকের চিত্তবিনোদন করে।

"ভারতবর্ষীয়েরা স্তম্ভের বিশেষ বিশেষ অংশ ও ভূষণের দীর্ঘতা, হ্রাসতা, স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা বিষয়ে ইজিপ্ত এবং গ্রীশীয়দিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের পিল্লার ভূষণ এবং যে সকল মনুষ্য-মূর্ত্তি ইমারত বহন করে (Caryatides) তৎসম্বন্ধে তাঁহারা উক্ত উভয় জাতিকে পরাজয় করিয়াছেন।"

শ্রীমাণি বাবু ভারতবর্ষীয় স্থাপত্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম যে সকল ভূগর্ভ এবং পর্ব্বতাভ্যন্তরে খোদিত হইয়া প্রস্তুত; দ্বিতীয়, যে সকল পর্ব্বতের বাহ্যাভ্যন্তরে উভয়েই খোদিত, এবং তৃতীয়, যে সকল প্রস্তর ও ইষ্টকাদি উপকরণে গঠিত।

প্রথম শ্রেণীর স্থাপত্যের উদাহরণ স্বরূপ ইলোরার গুহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকার লোহিত গ্রাণিট পর্ব্বতাভ্যন্তর অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়া খোদিত হইয়া এই বিখ্যাত গুহা সকল প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্থানের ব্যাস প্রায় ২॥০ ক্রোশ হইবে। স্থপতি কার্য্যে যত প্রকার গঠন ও অলঙ্কারপারিপাট্য থাকিতে পারে সে সকলই এই গুহা সকল মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—বহু ভূষণে বিভূষিত স্তম্ভ, অলিন্দ, চাঁদনী, সোপানশ্রেণী, সেতু, শিখর, গুম্বজাকার ছাদ, বৃহদাকার প্রতিমূর্ত্তি এবং ভিত্তি সংলগ্ন বহুবিধ খোদিত কারুকার্য্য—ইহার কিছুরই অভাব নাই।"

"অত্রত্য গৃহ সকল প্রায় দ্বিতল। কোন কোনটি তিনতলও আছে। কিন্তু প্রথম তল মৃত্তিকাদিতে প্রায় পরিপূর্ণ হওয়ায় তৎপ্রবেশ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। এতদ্‌গুহাস্থ ইন্দ্র সভা

অতীব বিস্তৃতা ও মনোহারিণী; ইহার অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ সকল ইদানীন্তন কালের ন্যায় নহে—একটী হাঁড়ী বিপরীত ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহাকে পদ্ম পাপড়ী দ্বারা বেষ্টন করিলে অত্রস্থ স্তম্ভ বোধিকার গঠন-প্রণালী কথঞ্চিৎ বোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু উল্টা হাঁড়ী বলিয়া আমাদিগের অনাদর করা উচিত নহে। কারণ, হাঁড়ীর গঠন কিছু বিশ্রী নহে, প্রত্যুত: শ্রীসম্পন্ন, তাহাতে ইহার মনোহর ভাস্কর্য্য, এবং সমুদয় স্তম্ভের বিভূষণ-সংযুক্ত-গঠন দেখিলে হৃদয় যে অপূর্ব্ব ভাবে উচ্ছ্বাসিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। অপরন্তু, এই বোধিকা সকল উৎকল দেশীয় বিমান সকলের চূড়ার নিম্নে আম্লাশিলার (আমলকী ফলের ন্যায় বর্ত্তুলাকার ও পল বিশিষ্ট বলিয়া আম্লাশিলা নামে খ্যাত) আকারে খোদিত। এই গুহার প্রশস্ত গৃহ সকলের বহিঃপ্রকোষ্ঠে শোভনীয় কীলকশ্রেণী বা গরাদিয়া সকল কর্ত্তিত হইয়াছে। অপর, ইহার প্রবেশ দ্বার অতীব মনোহর গঠনে গঠিত—দ্বাদশটী সূক্ষ্ম স্তম্ভোপরি অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত ইহার দিব্য গুম্বজ অদ্যাপিও সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। তৃতীয় চিত্রপটে ইন্দ্র সভায় যে চিত্র প্রদত্ত হইল তদ্দ্বারা পাঠক ইহার সুচারু রচনাচাতুর্য্য কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

"ইন্দ্রসভার অন্তঃপাতী তিনটী গুহা আছে। একটি ৬০ পাদ দীর্ঘ এবং ৪৮ পাদ প্রস্থ; ইহার ভিত্তিতে অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি সকল খোদিত আছে; ইহার গর্ভস্থানে ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। দ্বিতীয় গুহা-গর্ভের বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বের ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানীর মূর্ত্তিদ্বয়ের মধ্যে পরশুরামের মূর্ত্তি খোদিত আছে। তৃতীয় গুহার বহিঃপ্রকোষ্ঠে গজারূঢ়-পুরুষ এবং শার্দ্দূলপৃষ্ঠে-উপবিষ্টা এক স্ত্রীর মূর্ত্তি থাকায়, ইহাদিগকে ইন্দ্র ও শচী অনুমানে ব্রাহ্মণেরা এই গুহাত্রয়ের নাম ইন্দ্রসভা

রাখিয়াছেন। কিন্তু, ইহাও বক্তব্য যে, এই স্ত্রীমূর্ত্তিই প্রথম ও দ্বিতীয় গুহায় ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"'দুমার লয়না' অর্থাৎ বিবাহশালা নামে অপর এক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ গুহা আছে। ইহা ১২৫ হস্ত দীর্ঘ, এবং ১০০ হস্ত প্রস্থ। এই গুহার গর্ভস্থানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাতে অনেক দেব দেবীরও মূর্ত্তি সকল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তন্মধ্যে হরপার্ব্বতীর বিবাহ ব্যাপার খোদিত থাকায় এই গুহার নাম বিবাহশালা হইয়াছে।

"ইলোরার আর একটী প্রসিদ্ধ গুহার নাম 'কৈলাস:' ইহা ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ এক বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে নির্ম্মিত। ইহার প্রবেশ দ্বারে এক চমৎকার নহবৎখানা আছে, এবং এতন্মধ্যে এত অধিক সংখ্যক দেবতাদিগের লীলাপ্রকাশক মূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয় যে, তাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাঙ্গণের তিন দিকে স্তম্ভযুক্ত অলিন্দ এবং তাহার ভিত্তিতে বহুল দেবাদির মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে। গোপুরের পশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ, ইহা পাঁচটী মন্দিরে সম্পূর্ণ। মধ্যস্থ মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; ইহা ৪৪ হস্ত দীর্ঘ, এবং ৩৭ হস্ত প্রস্থ। এই মন্দির সকল খোদিত গজ ও শার্দ্দূলযুক্ত উপাসনোপরি স্থাপিত। এই গুহার পশ্চাদ্ভাগে একটী চাঁদনীর মধ্যে এত দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে যে, ইহাকে হিন্দুদেবতাদিগের প্রদর্শন গৃহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই গুহার সন্নিকটে অনেক গুহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং তৎসমুদয়ই পর্ব্বত খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। স্তম্ভ, ছাদ, প্রাচীর, অলিন্দ, গুম্বজ এবং অসংখ্য দেব দেবীর মূর্ত্তি— এ সকলই একখণ্ড প্রস্তর, ইহার কোন অংশ গ্রথিত নহে।

এই সমস্ত পর্ব্বত খোদিত করিতে কত সময়, কত শ্রম ও কত অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে স্তব্ধ হইতে হয়।"

"দ্বিতীয় শ্রেণীর স্থপতি কীর্ত্তি সকলের মধ্যে চিলামব্রুমের মন্দিরের বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"চিলামব্রুমের মন্দিরগুলি ১৩৩২ পাদ দীর্ঘ, ৯৩৬ পাদ প্রস্থ, এবং ৩০ পাদ উচ্চ ও ৭ পাদ প্রস্থ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণের প্রায় মধ্যস্থলে ও ঈষৎ পূর্ব্বদিকে একটি চমৎকার বৃহদাকার মন্দির আছে। ইহা দীর্ঘে ২২৪ পাদ এবং প্রস্থে ৬৪ পাদ; ইহার সম্মুখে এক চাঁদনী আছে, উহা সহস্র স্তম্ভে সুশোভিত! উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরস্থ মূর্ত্তিসকল ভারতবর্ষীয় যাবতীয় দেব দেবীর আদর্শে খোদিত। কিন্তু ইহার মধ্যে এরূপ একটি অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি আছে যে, তাহা ভূমণ্ডলের অন্য কোন স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুষ্কোণাকার-স্তম্ভ-শ্রেণী-সংলগ্ন এক প্রস্তর-শৃঙ্খল খোদিত আছে, তাহা দীর্ঘে ১৪৬ পাদ এবং তাহার প্রত্যেক কড়া তিন পাদ দীর্ঘ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহা ভিত্তিসংলগ্ন নহে, কেবল মাত্র স্তম্ভ হইতে স্তম্ভান্তরে সংযোজিত, অবশিষ্টাংশ শূন্যে ঝুলিয়া আছে। অপর এই মন্দিরের প্রবেশদ্বারে এরূপ উৎকৃষ্ট খোদিত মূর্ত্তি সকল এবং এরূপ দুইটী মনোহর শোভাসম্পন্ন পিল্পা আছে যে প্রসিদ্ধ শিল্প-নিপুণ গ্রীকজাতিও উক্ত প্রকার গঠনে ঐরূপ অলঙ্কার যোজনা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।"*

মহাবালীপুরের মন্দিরের প্রসঙ্গে লিখিত আছে, যে "এই নগরস্থ প্রধান মন্দিরে সাতিশয় সুন্দর গঠনে সুশোভিত মনুষ্য মূর্ত্তি সকল অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে। একজন ইউরোপীয় স্বচক্ষে দেখিয়া লিখিয়াছেন তাহাদের কোন কোন অংশ বিশে-

বতঃ সুশ্রী, সুবিখ্যাত ভাস্করবিদ্যা-বিশারদ কানরা কৃত মূর্ত্তি সকলের তুল্য।”

তৃতীয় শ্রেণীর স্থাপত্যের প্রধান উদাহরণ, ভুবনেশ্বর। আবু পর্ব্বতস্থ জৈন মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ অলঙ্কার সম্বন্ধে শ্রীমাণি বাবু লিখিয়াছেন, যে তাহার সাদৃশ্য বোধ হয় ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

“বিখ্যাত ফরগুসন সাহেব বলিয়াছেন যে, এরূপ বহুব্যয়াস-সম্পন্ন এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি কার্য্য বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই এবং উক্ত মহাত্মা ইহার চাঁদনী লক্ষ্য করিয়া কহিয়াছেন যে, সে কৃষ্ণফর রেনের লণ্ডন প্রভৃতির সুবিখ্যাত ধর্ম্মমন্দির সকল এই জৈন চাঁদনীর সহিত সৌসাদৃশ্য সম্পন্ন হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইত। এই কীর্ত্তি ১০৩২ খ্রীঃ অব্দে নির্ম্মিত হয়। ইহাতে ১৮০০০০০০০ অষ্টাদশ কোটী টাকা এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল।”

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্যের দুইটী মাত্র দোষের উল্লেখ আছে, বিজনতা এবং আলোকাভাব।

ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্যের গৌরব, স্থাপত্য গৌরবের ন্যায় নহে. তথাপি আমাদিগের প্রাচীন ভাস্কর্য্য, আধুনিক দেশী ভাস্কর্য্যাপেক্ষা সহস্র গুণে প্রশংসনীয়।

শ্রীমাণি বাবু কয়েকটি উদাহরণের বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন।

“বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট শিল্প বিদ্যালয়ের সুদক্ষ অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত লক সাহেব মহোদয় ভুবনেশ্বরান্তর্গত এক মন্দিরভিত্তিতে একটী দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন; তিনি বলেন যে উহা কোমল ও সুখস্পর্শ রক্ত মাংসে গঠিত বলিয়া বোধ হয়, কঠিন প্রস্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। বাস্তবিক অস্মদ্দেশীয়

ভাস্কর্য্যের ইহা একটী প্রধান ধর্ম্ম—সর্ব্বত্রেই ইহার গৌরবের কথা শ্রবণগোচর হয়। পাঠক! বোধ করি আপনি অবগত আছেন যে এইরূপ সুখস্পর্শ ও কোমলগঠন এবং মনোহর অঙ্গবিন্যাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যের লক্ষণ। অতএব আপনি শুনিলে আনন্দিত হইবেন যে আর্য্যগণ এই সকল উৎকৃষ্ট লক্ষণ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অধিকাংশ প্রতিমূর্ত্ত্যাদি বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন! এই জাতীয় শিল্পের অপর একটী উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম "প্রয়োজন সিদ্ধি" অর্থাৎ, শিল্পী পুত্তলিকাদিগকে যে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিবার কল্পনা করিয়াছেন দৃষ্টি মাত্রে দর্শকের মনে সেই সেই উদ্দেশ্য-সাধন ভাবের উপলব্ধি হয়। আমি আহ্লাদের সহিত ব্যক্ত করিতেছি যে অনেক বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত অস্মদ্দেশীয় পৌরাণিক ভাস্কর্য্যে এই মহদ্ গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন!"

পরে মথুরার বিখ্যাত পুত্তলিকা সকলের বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন। অনেকে উহা গ্রীকশিল্পিনির্ম্মিত সাইলেনসের প্রতিমূর্ত্তি বিবেচনা করেন। শ্রীমাণি বাবু এ কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন।* তিনি বলেন যে উহা হিন্দু শিল্পকরের খোদিত কৃষ্ণলীলা বর্ণন। সাইলেনস নহে—বলরাম। যদি এই ভাস্কর্য্য হিন্দু প্রণীত হয়, তবে সে হিন্দু গ্রীকদিগের নিকট শিল্প শিক্ষা

* গ্রীক্ জাতিরা মথুরা পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, একথা অসম্ভব বলিয়া শ্রীমাণি মহাশয় যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর। হণ্টর সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, যে গ্রীকজাতীয়েরা মধ্য ভারতবর্ষের নানা স্থানে বাস করিত। মহাভাষ্যের বিখ্যাত উদাহরণ "অরুণৎ যবনো সাকেতম্," শ্রীমাণি মহাশয় কি বিস্মৃত হইয়াছেন? যখন গ্রীকেরা অযোধ্যা অবরোধ করিয়াছিল তখন মথুরায় না আসিবে কেন?

করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। তাহার বিশেষ চিহ্ন আছে। ভারতবর্ষীয় ভাস্কর্য্য মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নশ্বর চিত্রপট, অযত্নে রাখিলে, প্রস্তরাদির ন্যায় অধিককাল স্থায়ী হয় না; এজন্য শ্রীমাণি বাবু অজন্তা ও বাঘের গুহাস্থিত ফ্রেস্কো পেণ্টিং ভিন্ন আর কোন চিত্রের উল্লেখ করিতে পারেন নাই। প্রধানতঃ তাঁহাকে নাটকের সাক্ষিতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। সে প্রমাণ আমরা বিশেষ সন্তোষজনক বিবেচনা করি না; কবির স্বভাব এই যে প্রকৃত অনুৎকৃষ্ট হইলেও, তাহাকে উৎকর্ষ প্রদান করেন। উত্তরচরিত ও শকুন্তলায় যে চিত্র বিদ্যার পরিচয় আছে, ততদূর নৈপুণ্য যে ভারতবর্ষীয়েরা লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে অন্য প্রমাণ আবশ্যক।

যাহাহউক, শ্রীমাণি বাবুর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাঠে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায়, দ্বিতীয় গ্রন্থ নাই; এই প্রথমোদ্যম। গ্রন্থে পরিচয় পাওয়া যায় যে শ্রীমাণি বাবু স্বয়ং সুশিক্ষিত, এবং শিল্প সমালোচনায় সুপটু। এবং গ্রন্থ প্রণয়নে বিশেষ পরিশ্রমও করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিশেষ পরিচয়ে পাঠকগণ সন্তুষ্টিলাভ করিবেন বলিয়াই, আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে এত কথা উদ্ধৃত করিতে সাহস করিয়াছি।

উপসংহারে, স্বদেশীয় মহাশয়গণকে দুই একটা কথা নিবেদন করিলে ক্ষতি নাই। বাঙ্গালি বাবুদিগের নিকট সূক্ষ্ম শিল্প সম্বন্ধে কোন কথা বলা, দুই চারি জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের কাছে, ভস্মে ঘৃত ঢালা হয়। সৌন্দর্য্যানুরাগিণী প্রবৃত্তি বোধ হয় এত অল্প অন্য কোন সভ্যজাতির নাই। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাই, সভ্যতার একটি প্রধান লক্ষণ, এবং বাঙ্গালিরা এখনও যে সভ্যপদ বাচ্য নহেন, ইহাই তাহার একটি প্রমাণ।

তাঁহারা গৃহিণীর মুখখানি সুন্দর দেখিতে ভাল বাসেন বটে— এবং কতকটা পুত্রবধূর সম্বন্ধেও তাই, কিন্তু অন্যত্র সে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা তত বলবতী নহে। সঙ্গতি থাকিলেও ছেঁড়া মাদুর ছেঁড়া বালিশ, দুর্গন্ধ মসি এবং তৈল চিত্রিত জাজিম, আমরা বড় ভাল বাসি। পরিধেয় সম্বন্ধে রজককে বঞ্চনা করাই বাঙ্গালি জাতির জীবনযাত্রার একটী প্রধান বীরত্ব। গৃহমধ্যে পূতিগন্ধবিশিষ্ট, কদর্য্য কীটসঙ্কুল, দৃষ্টিপীড়ক কতকগুলি স্থান না থাকিলে বাঙ্গালির জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। বরং বন্য-পশু পরিস্কৃতাবস্থায় থাকে, তথাপি বাঙ্গালি নহে। ঈদৃশ জাতির সৌন্দর্য্যস্পৃহা কোথায়? এবং যে বিদ্যার একমাত্র উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য, তাহার আদর কি প্রকারে সম্ভবে? সুতরাং বাঙ্গালার সূক্ষ্ম শিল্পের এত দুর্দ্দশা।)

স্বীকার করি, সকল দোষ টুকু বাঙ্গালির নিজের নহে। কতকটা বাঙ্গালির সামাজিক রীতির দোষ;—পূর্ব্বপুরুষের ভদ্রাসন পরিত্যাগ করা হইবে না, তাতেই অসংখ্য সন্তান সন্ততি লইয়া গর্ত্তমধ্যে পিপীলিকার ন্যায়, পিল্ পিল্ করিতে হইবে—সুতরাং স্থানাভাববশতঃ পরিস্কৃতি এবং সৌন্দর্য্যসাধন সম্ভবে না। কতকটা, বাঙ্গালির দারিদ্র জন্য। সৌন্দর্য্য অর্থ-সাধ্য—অনেকের সংসার চলে না। তাহার উপর সামাজিক রীত্যনুসারে, আগে পৌরস্ত্রীগণের অলঙ্কার, দোলদুর্গোৎসবের ব্যয় পিতৃশ্রাদ্ধ মাতৃশ্রাদ্ধ, পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে, অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হইবে—সে সকল ব্যয় সম্পন্ন করিয়া, শূকরশালা তুল্য কদর্য্য স্থানে বাস করিতে হইবে, ইহাই সামাজিক রীতি। ইচ্ছা করিলেও, সমাজশৃঙ্খলে বদ্ধ বাঙ্গালি, সে রীতির বিপরীতাচরণ করিতে পারেন না। কতকটা হিন্দুধর্ম্মের দোষ; যে ধর্ম্মানুসারে, উৎকৃষ্ট মর্ম্মরপ্রস্তুত হর্ম্ম্যও গোময়

লেপনে পরিষ্কৃত করিতে হইবে, তাহার প্রসাদে সূক্ষ্ম শিল্পের দুর্দ্দশারই সম্ভাবনা।

এ সকল স্বীকার করিলেও, দোষক্ষালন হয় না। যে ফিরিঙ্গি কেরাণীগিরি করিয়া শত মুদ্রায়, কোন মতে দিনপাত করে, তাহার সঙ্গে বৎসরে বিংশতি সহস্র মুদ্রার অধিকারী গ্রাম্য ভূস্বামীর গৃহপারিপাট্য বিষয়ে তুলনা কর। দেখিবে, এ প্রভেদটি অনেকটাই স্বাভাবিক। দুই চারি জন ধনাঢ্য বাবু, ইংরেজদিগের অনুকরণ করিয়া, ইংরেজের ন্যায় গৃহাদির পারিপাট্য বিধান করিয়া থাকেন এবং ভাস্কর্য্য, ও চিত্রাদির দ্বারা গৃহ সজ্জিত করিয়া থাকেন। বাঙ্গালি নকল নবিশ ভাল, নকলে শৈথিল্য নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের ভাস্কর্য্য এবং চিত্র সংগ্রহ দেখিলেই বোধ হয় যে অনুকরণ স্পৃহাতেই ঐ সকল সংগ্রহ ঘটিয়াছে—নচেৎ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদিগের আন্তরিক অনুরাগ নাই। এখানে ভাল মন্দের বিচার নাই, মহার্ঘ্য হইলেই হইল; সন্নিবেশের পারিপাট্য নাই, সংখ্যায় অধিক হইলেই হইল। ভাস্কর্য্য চিত্র দূরে থাকুক, কাব্য সম্বন্ধেও বাঙ্গালির উত্তমাধম বিচারশক্তি দেখা যায় না। এ বিষয়ে সুশিক্ষিত অশিক্ষিত সমান—প্রভেদ অতি অল্প। সৌন্দর্য্যবিচার শক্তি, সৌন্দর্য্য রসাস্বাদন সুখ, বুঝি বিধাতা বাঙ্গালির কপালে লিখেন নাই।

কৃষ্ণ চরিত্র।

আমরা অন্য প্রবন্ধে মানস বিকাশের সমালোচনায় বলিয়া রাখিয়াছি, যে যেমন অন্যান্য ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রূপ। দেশভেদে, ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে অবস্থার নহে; মহাভারত যে অবস্থার উক্তি, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে। তথায় দেখান গিয়াছে যে বঙ্গীয় গীতি-কাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা, এবং গৃহসুখনিরতির ফল। অদ্য সেই কথা স্পষ্টীকরণে প্রবৃত্ত হইব।

বিদ্যাপতি, এবং তদনুবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের গীতের বিষয় একমাত্র কৃষ্ণ ও রাধিকা। বিষয়ান্তর নাই। তজ্জন্য এই সকল কবিতা অনেক আধুনিক বাঙ্গালির অরুচিকর। তাহার কারণ এই যে, নায়িকা, কুমারী বা নায়কের শাস্ত্রানুসারে পরিণীতা পত্নী নহে, অন্যের পত্নী; অতএব সামান্য নায়কের সঙ্গে কুলটার প্রণয় হইলে যেমন, অপবিত্র, অরুচিকর, এবং পাপে পঙ্কিল হয়, কৃষ্ণলীলাও তাঁহাদের বিবেচনায় তদ্রূপ—অতি কদর্য্য পাপের আধার। বিশেষ এসকল কবিতা অনেক সময় অশ্লীল, এবং ইন্দ্রিয়ের পুষ্টিকর—অতএব ইহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসারগ্রাহী। যদি কৃষ্ণলীলার এই ব্যাখ্যা হইত, তবে ভারতবর্ষে কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণগীতি কখন এতকাল স্থায়ী হইত না। কেন না অপবিত্র কাব্য কখন স্থায়ী হয় না। এ বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ জন্য আমরা এই নিগূঢ় তত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদিগের নায়ক, সেইরূপ জয়দেবে, ও সেইরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্রের আদি শ্রীমদ্ভাগবতেও নহে। ইহার আদি মহাভারতে। জিজ্ঞাস্য এই যে মহাভারতে যে কৃষ্ণচরিত্র দেখিতে পাই, শ্রীমদ্ভাগবতেও কি সেই কৃষ্ণের চরিত্র? জয়দেবেও কি তাই? এবং বিদ্যাপতিতেও কি তাই? চারিজন গ্রন্থকারই কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু চারিজনেই কি এক প্রকার সে ঐশিক চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন? যদি না করিয়া থাকেন, তবে প্রভেদ কি? যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে?

প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে, ইহা বিবেচনা করা অকর্ত্তব্য। কাব্যে২ প্রভেদ নানাপ্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি, জাতীয়চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবি মাত্রেরই কতকগুলিন বিশেষ দোষ গুণ আছে যাহা ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সে গুলি তাঁহাদিগের জাতীয় দোষ গুণ। প্রাচীন কবি মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে, যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেই গুলি তাঁহাদিগের সাময়িক লক্ষণ। আর কবি মাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র আছে। সে গুলি তাঁহাদিগের নিজ গুণ।

অতএব, কাব্য বৈচিত্রের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্র্য। যদি চারিজন কবি কর্ত্তৃক গীত কৃষ্ণ চরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন

প্রকারই থাকিবার সম্ভাবনা। বঙ্গবাসী, জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারতকার বা শ্রীমদ্ভাগবতকারের জাতীয়তা জনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা, তুলসীদাসে এবং কৃত্তিবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কৃষ্ণচরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কি না ইহারই অনুসন্ধান করিব।

মহাভারত কোন্ সময়ে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা এপর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। নিরূপিত হওয়াও অতি কঠিন। মূলগ্রন্থ একজন প্রণীত বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে যাহা মহাভারত বলিয়া প্রচলিত, তাহার সকল অংশ কখন একজনের লিখিত নহে। যেমন একজন, একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া গেলে, তাঁহার পরপুরুষেরা তাহাতে কেহ একটি নূতন কুঠারি, কেহ বা একটি নূতন বারেণ্ডা, কেহ বা একটি নূতন প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, মহাভারতেরও তাহাই ঘটিয়াছে। মূলগ্রন্থের ভিতর পরবর্ত্তী লেখকেরা কোথাও কতকগুলি কবিতা কোথাও একটি উপন্যাস, কোথাও একটি পর্ব্বাধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া বহু সরিতের জলে পুষ্ট সমুদ্রবৎ বিপুল কলেবর করিয়া তুলিয়াছেন। কোন্ ভাগ আদিগ্রন্থের অংশ, কোন্ ভাগ আধুনিক সংযোগ, তাহা সর্ব্বত্র নিরূপণ করা অসাধ্য। অতএব আদি গ্রন্থের বয়ঃক্রম নিরূপণ অসাধ্য। তবে উহা যে শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বগামী ইহা বোধ হয় সুশিক্ষিত কেহই অস্বীকার করিবেন না। যদি অন্য প্রমাণ নাও থাকে, তবে কেবল রচনাপ্রণালী দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। ভাগবতের সংস্কৃত অপেক্ষাকৃত আধুনিক; ভাগবতে কাব্যের গতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক পথে।

অতএব প্রথম মহাভারত। মহাভারত খ্রীষ্টাব্দের অনেক

পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাও অনুভবে বুঝা যায়। মহাভারত পড়িয়া বোধ হয়, ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বিতীয়াবস্থা, অথবা তৃতীয়াবস্থা ইহাতে পরিচিত হইয়াছে। তখন দ্বাপর, সত্য যুগ আর নাই। যখন স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী তীরে, নবাগত আর্য্য বংশ সরল গ্রাম্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া, দস্যুভয়ে আকাশ, ভাস্কর মরুতাদি ভৌতিক শক্তিকে আত্মরক্ষার্থ আহ্বান করিয়া, অপেয় সোমরস পানকে জীবনের সার সুখ জ্ঞান করিয়া আর্য্য জীবন নির্ব্বাহ করিতেন, সে সত্য যুগ আর নাই। দ্বিতীয়াবস্থাও নাই। যখন, আর্য্যগণ সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া, বহু যুদ্ধে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, দস্যুজয়ে প্রবৃত্ত, সে ত্রেতা আর নাই। যখন আর্য্যগণ, বাহুবলে বহুদেশ অধিকৃত করিয়া, শিল্পাদির উন্নতি করিয়া, প্রথম সভ্যতার সোপানে উঠিয়া, কাশী, অযোধ্যা, মিথিলাদি নগর সংস্থাপিত করিতেছেন, সে ত্রেতা আর নাই। যখন, আর্য্যহৃদয়ক্ষেত্রে নূতন জ্ঞানের অঙ্কুর দেখা দিতেছে, সে ত্রেতা আর নাই। এক্ষণে দস্যুজাতি বিজিত, পদানত, দেশপ্রান্তবাসী শূদ্র, ভারতবর্ষ আর্য্যগণের করস্থ, আয়ত্ত, ভোগ্য, এবং মহাসমৃদ্ধিশালী। তখন আর্য্যগণ বাহ্য শত্রুর ভয় হইতে নিশ্চিন্ত, আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে সচেষ্ট,—হস্তগতা অনন্তরত্নপ্রসবিনী ভারতভূমি অংশীকরণে ব্যস্ত। যাহা সকলে জয় করিয়াছে তাহা কে ভোগ করিবে? এই প্রশ্নের ফল আভ্যন্তরিক বিবাদ। তখন আর্য্য পৌরুষ চরমে দাঁড়াইয়াছে। যে হলাহল বৃক্ষের ফলে, দুই সহস্র বৎসর পরে জয়চন্দ্র এবং পৃথ্বীরাজ পরস্পর বিবাদ করিয়া উভয়ে সাহাবুদ্দিনের করতলস্থ হইলেন, এই দ্বাপরে তাহার বীজ বপন হইয়াছে। এই দ্বাপরের কার্য্য মহাভারত।(১)

(১) পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে কতিপয় শতাব্দকে এখানে "যুগ" বলা যাইতেছে।

এরূপ সমাজে দুই প্রকার মনুষ্য সংসারচিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ান; এক সমরবিজয়ী বীর, দ্বিতীয় রাজনীতি বিশারদ মন্ত্রী। এক মল্টকে, দ্বিতীয় বিস্মার্ক; এক গারিবল্ডি, দ্বিতীয় কাবুর; মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এক অর্জ্জুন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ।

এই মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্রকাব্য সংসারে তুলনারহিত। যে ব্রজলীলা জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যের একমাত্র অবলম্বন, যাহা শ্রীমদ্ভাগবতেও অত্যন্ত পরিস্ফুট, ইহাতে তাহার সূচনাও নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্—সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য্য—সেই জন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত। শ্রীকৃষ্ণ ঐশিক শক্তিধর বলিয়া কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি অস্ত্রধারী নহেন, সামান্য জড়শক্তি বাহুবল ইহার বল নহে; উচ্চতর মানসিক বলই ইহার বল। যে অবধি ইনি মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল গ্রন্থি রজ্জু ইহার হাতে—প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা—কৌশলে সর্ব্বকর্ত্তা। ইহার কেহ মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, কেহ অন্ত পায় না, সে অনন্তচক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না। ইহার যেমন দক্ষতা, তেমনই ধৈর্য্য। উভয়েই দেবতুল্য। পৃথিবীর বীরমণ্ডলী একত্রিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত, যে ধনু ধরিতে জানে সেই কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবদিগের পরমাত্মীয় হইয়াও, কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধরেন নাই। তিনি মানসিক শক্তি মূর্ত্তিমান্, বাহুবলের আশ্রয় লইবেন না। তাঁহার অভীষ্ট, পৃথিবীর রাজকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, একা পাণ্ডব পৃথিবীশ্বর থাকেন; স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়ের নিধন না হইলে তাহা ঘটে না; যিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত, তিনি, স্বয়ং রণে প্রবৃত্ত হইলে, যে পক্ষাবলম্বন করিবেন সেই পক্ষের সম্পূর্ণ

রক্ষা সম্ভাবনা। কিন্তু তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কেবল পাণ্ডবদিগকে একেশ্বর করাও তাঁহার অভীষ্ট নহে। ভারতবর্ষের ঐক্য তাঁহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষ তখন ক্ষুদ্র২ খণ্ডে বিভক্ত; খণ্ডে২ এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষুদ্র২ রাজগণ পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া পরস্পরকে ক্ষীণ করিত, ভারতবর্ষ অবিরত সমরানলে দগ্ধ হইতে থাকিত। শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে এই সসাগরা ভারত একচ্ছত্রাধীন না হইলে ভারতের শান্তি নাই; শান্তি ভিন্ন লোকের রক্ষা নাই; উন্নতি নাই। অতএব এই ক্ষুদ্র২ পরস্পর বিদ্বেষী রাজগণকে প্রথমে ধ্বংস করা কর্ত্তব্য; তাহা হইলেই ভারতবর্ষ একায়ত্ত, শান্ত, এবং উন্নত হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাহারা পরস্পরের অস্ত্রে পরস্পরে নিহত হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। ইহারই পৌরাণিক নাম পৃথিবীর ভারমোচন। শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া, এক পক্ষের রক্ষা চেষ্টা করিয়া, কেন সে উদ্দেশ্যের বিঘ্ন করিবেন? তিনি বিনা অস্ত্রধারণে, অর্জ্জুনের রথে বসিয়া, ভারত রাজকুলের ধ্বংস সিদ্ধ করিলেন।

এইরূপ, মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই তাহাতে এই ক্রূরকর্ম্মা দূরদর্শী রাজনীতি বিশারদের লক্ষণ সকল দেখা যাইবে। তাহাতে বিলাসপ্রিয়তার লেশ মাত্র নাই—গোপবালকের চিহ্ন মাত্র নাই।

এদিকে দর্শন শাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব হইতেছিল। বৈদিক ও পৌরাণিক দেবগণের আরাধনা করিয়া আর মার্জ্জিতবুদ্ধি আর্য্যগণ সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা দেখিলেন, যে, যে সকল ভিন্ন২ নৈসর্গিক শক্তিকে তাঁহারা পৃথক২ দেবকল্পনা করিয়া পূজা করিতেন, সকলেই এক মূল শক্তির ভিন্ন২ বিকাশ মাত্র। জগৎকর্ত্তা এক এবং অদ্বিতীয়। তখন ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ লইয়া

মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, ঈশ্বর আছেন, কেহ বলিলেন নাই। কেহ বলিলেন ঈশ্বর এই জড় জগৎ হইতে পৃথক্, কেহ বলিলেন এই জড় জগৎই ঈশ্বর। তখন, নানা জনের নানা মতে, লোকের মন অস্থির হইয়া উঠিল; কোন্ মতে বিশ্বাস করিবে? কাহার পূজা করিবে? কোন্ পদার্থে ভক্তি করিবে? দেব ভক্তির জীবন নিশ্চয়তা—অনিশ্চয়তা জন্মিলে ভক্তি নষ্ট হয়। পুনঃ২ আন্দোলনে ভক্তিমূল ছিন্ন হইয়া গেল। অর্দ্ধাধিক ভারতবর্ষ নিরীশ্বর বৌদ্ধমত অবলম্বন করিল। সনাতন ধর্ম্ম মহাশঙ্কটে পতিত হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রূপে কাটিয়া গেলে শ্রীমদ্ভাগবতকার সেই ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে দ্বিতীয় কৃষ্ণ চরিত্র প্রণীত হইল।

আচার্য্য টিণ্ডল একস্থানে ঈশ্বর নিরূপণের কাঠিন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, যে, যে ব্যক্তি একাধারে উৎকৃষ্ট কবি, এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হইবে সেই ঈশ্বর নিরূপণে সক্ষম হইবে। প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকতা এবং প্রথম শ্রেণীর কবিত্ব, একাধারে এ পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত হয় নাই। একব্যক্তি নিউটন ও সেক্ষপীয়রের প্রকৃতি লইয়া এ পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই: কিন্তু বৈজ্ঞানিক কবি কেহ না হইয়া থাকুন, দার্শনিক কবি অনেক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—ঋগ্বেদের ঋষিগণ হইতে রাজকৃষ্ণবাবু পর্য্যন্ত ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দার্শনিক কবিগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর নিরূপণে সমর্থ বিবেচনা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতকার দার্শনিক এবং শ্রীমদ্ভাগবতকার কবি। তিনি দর্শনে ও কাব্যে মিলাইয়া, ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং এই ভূমণ্ডলে এরূপ দুরূহ ব্যাপারে যদি কেহ কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, তবে শাক্যসিংহ ও শ্রীমদ্ভাগবতকার হইয়াছেন।

দার্শনিকদিগের মতের মধ্যে একটি মত, পণ্ডিতের নিকট অতিশয় মনোহর। সাংখ্যকার, মানস রসায়নে জগৎকে বিশ্লিষ্ট করিয়া, আত্মা এবং জড়জগতে ভাগ করিয়া ফেলিলেন। জগৎ দ্বৈপ্রকৃতিক—তাহাতে পুরুষ এবং প্রকৃতি বিদ্যমান। কথাটি অতি নিগূঢ়,—বিশেষ গভীরার্থপূর্ণ। ইহা প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের শেষ সীমা। গ্রীক্ পণ্ডিতেরা বহুকষ্টে এই তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইয়া ছিলেন। অদ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্ত্বের চতুঃপার্শ্বে অন্ধ মধুমক্ষিকার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কথাটীর স্থূল মর্ম্ম যাহা তাহা সাংখ্যদর্শন বিষয়ক প্রবন্ধে বুঝাইয়াছি। এই প্রকৃতি ও পুরুষ সাংখ্য মতানুসারে পরস্পরে আসক্ত, স্ফাটিকপাত্রে জবা পুষ্পের প্রতিবিম্বের ন্যায়, প্রকৃতিতে পুরুষ সংযুক্ত, ইহাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ বিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি।

এই সকল দুরূহ তত্ত্ব দার্শনিকের মনোহর, কিন্তু সাধারণের বোধগম্য নহে। শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহাকেই জন সাধারণের বোধগম্য, এবং জনসাধারণের মনোহর করিয়া সাজাইয়া, মৃত ধর্ম্মে জীবন সঞ্চারের অভিপ্রায় করিলেন। মহাভারতে যে বীর, ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া, প্রকৃতি স্থানীয় করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যে পরস্পরাসক্তি, বাল্য লীলায় তাহা দেখাইলেন; এবং তত্ত্বভয়ে যে সম্বন্ধবিচ্ছেদ, জীবের মুক্তির জন্য কামনীয়, তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই জীবের দুঃখের মূল—তাই কবি এই মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য্য, আত্মার ইতিহাস—প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি।

জয়দেবপ্রণীত তৃতীয় কৃষ্ণ চরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য। তখন আর্য্যজাতির জাতীয় জীবন দুর্ব্বল হইয়া আসিয়াছে। রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে—ধর্ম্মের বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উগ্রতেজস্বী, রাজনীতিবিশারদ আর্য্য বীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জ্জিত চিত্ত দার্শনিকের স্থানে অপরিণামদর্শী স্মার্ত্ত এবং গৃহ সুখবিমুগ্ধ কবি অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত দুর্ব্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার স্থানে রাজপুরী সকলে নূপুর নিক্কণ বাজিতেছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্ত্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গীর নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীত গোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ, কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্ত্তি, অপূর্ব্ব মোহন মূর্ত্তি; শব্দ ভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকল গুলি বাছিয়া বাছিয়া, চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাণ্ডারে, যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্ন আছে, সকল গুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন; কিন্তু যে মহা গৌরবের জ্যোতিঃ মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণ চরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রখর সুখতৃষাতপ্ত আর্য্য পান্থকে শীতল করিতেছে।

তার পর, বঙ্গদেশ যবন হস্তে পতিত হইল। পথিক যেমন বনে রত্ন কুড়াইয়া পায়, যবন সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল। প্রথমে নাম মাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যবন শাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আবার বঙ্গ-

দেশের কপালে ছিল, যে জাতীয় জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। সেই পুনরুদ্দীপ্ত জীবন বলে, বঙ্গভূমে রঘুনাথ, ও চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্যাপতি তাঁহাদিগের পূর্ব্বগামী,—পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা। তিনি জয়দেব প্রণীত চিত্রখানি তুলিয়া লইলেন—তাহাতে নূতন রঙ্গ চালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির দৃষ্টি তেজস্বিনী—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিশোরবয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ্য প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পর্য্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগতৃষা বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল—বিদ্যাপতি তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন। জয়দেবের সময় সুখভোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল না। বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়। ধর্ম্ম লুপ্ত, বিধর্ম্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, সবে মাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে—কবির চক্ষু ফুটিল। কবি, সেই দুঃখে, দুঃখ দেখিয়া, দুঃখের গান গাইলেন। আমরা বিদ্যাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ সবিস্তারে দেখাইয়াছি; সেই সকল কথার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এস্থলে, কেবল ইহাই বক্তব্য, যে সাময়িক প্রভেদ, এই সকল প্রভেদের একটি কারণ। বিদ্যাপতির সময়ে, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেব কৃত ধর্ম্মের নবাভ্যুদয়ের, এবং রঘুনাথ কৃত দর্শনের নবাভ্যুদয়ের পূর্ব্বসূচনা হইয়াছিল; বিদ্যাপতির কাব্যে সেই নবাভ্যুদয়ের সূচনা লক্ষিত হয়। তখন বাহ্য ছাড়িয়া, আভ্যন্তরিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই আভ্যন্তরিক দৃষ্টির ফল ধর্ম্ম ও দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি।

দ্রৌপদী।

কি প্রাচীন, কি আধুনিক হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমল প্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী —ইনিই আর্য্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র। অন্য কোন প্রকৃতির নায়িকা যে আর্য্যসাহিত্যে দেখা যায় না, এমত কথা বলিতেছি না—কিন্তু সীতানুবর্ত্তিনী নায়িকারই বাহুল্য। আজিও, যিনি সস্তা ছাপাখানা পাইয়া নবেল নাটকাদিতে বিদ্যা প্রকাশ করিতে চাহেন, তিনিই সীতা গড়িতে বসেন।

ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্য্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্য্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

(মহাভারতকার যে রামায়ণকে এক প্রকার আদর্শ করিয়া কিম্বদন্তীমূলক বা পুরাণকথিত ঘটনা সকলকে ইতিহাস সূত্রে গ্রন্থিত করিয়াছেন, স্থানান্তরে এমত কথার আভাস দেওয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রধান নায়িকা সম্বন্ধে মহাভারতকার নিতান্ত নিরপেক্ষ। মহাভারতে নায়ক নায়িকার ছড়াছড়ি—অতএব সীতাচরিত্রানুবর্ত্তিনী নায়িকারও অভাব নাই কিন্তু) দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে, মহাভারতকার

অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।

সীতা সতী, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকেও মহাভারতকার সতী বলিয়াই পরিচিতা করিয়াছেন, কেন না, কবির অভিপ্রায় এই যে পতি এক হৌক, পাঁচ হৌক, পতিমাত্র ভজনাই সতীত্ব। উভয়েই পত্নী ও রাজ্ঞীর কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে অক্ষুণ্ণমতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং গুরুজনের বাধ্য। কিন্তু এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী। সীতায় স্ত্রীজাতির কোমল গুণ গুলিন পরিস্ফুট,দ্রৌপদীতে স্ত্রীজাতির কঠিন গুণ সকল প্রদীপ্ত। সীতা রামের যোগ্যা জায়া, দ্রৌপদী ভীমসেনেরই সুযোগ্যা বীরেন্দ্রাণী। সীতাকে হরণ করিতে রাবণের কোন কষ্ট হয় নাই, কিন্তু রক্ষোরাজ লঙ্কেশ যদি দ্রৌপদীহরণে আসিতেন, তবে বোধ হয়, হয় কীচকের ন্যায় প্রাণ হারাইতেন, নয় জয়দ্রথের ন্যায়, দ্রৌপদীর বাহুবলে ভূমে গড়াগড়ি দিতেন।

দ্রৌপদী চরিত্রের রীতিমত বিশ্লেষণ দুরূহ; কেন না মহাভারত অনন্ত সাগর তুল্য, তাহার অজস্র তরঙ্গাভিঘাতে একটি নায়িকা বা নায়কের চরিত্র তৃণবৎ কোথায় যায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কে করিতে পারে। তথাপি দুই একটা স্থানে বিশ্লেষণে যত্ন করিতেছি।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর। দ্রুপদরাজার পণ, যে, যে সেই দুর্বেধনীয় লক্ষ্য বিঁধিবে, সেই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিবে। কন্যা সভাতলে আনীতা। পৃথিবীর রাজগণ, বীরগণ, ঋষিগণ সমবেত। এই মহাসভায় প্রচণ্ড প্রতাপে কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। সেই বিশোষ্যমাণা কুমারী লাভার্থ, দুর্য্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি ভুবনপ্রথিত মহাবীর সকল লক্ষ্য

বিঁধিতে যত্ন করিতেছেন। একে একে সকলেই বিন্ধনে অক্ষম হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। হায়! দ্রৌপদীর বিবাহ হয় না।

অন্যান্য রাজগণ মধ্যে সর্ব্ববীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গাধিপতি কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিলেন। ক্ষুদ্র কাব্যকার এখানে কি করিতেন বলা যায় না—কেন না এটি বিষম সঙ্কট। কাব্যের প্রয়োজন, পাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ দেওয়াইতে হইবে। কর্ণ লক্ষ্য বিঁধিলে তাহা হয় না। ক্ষুদ্র কবি বোধ হয়, কর্ণকেও লক্ষ্য বিন্ধনে অশক্ত বলিয়া পরিচিত করিতেন। কিন্তু মহাভারতের মহা কবি জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছেন, যে কর্ণের বীর্য্য, তাঁহার প্রধান নায়ক অর্জ্জুনের বীর্য্যের মানদণ্ড। কর্ণ প্রতি-দ্বন্দী এবং অর্জ্জুনহস্তে পরাভূত বলিয়াই অর্জ্জুনের গৌরবের এত আধিক্য; কর্ণকে অন্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রবীর্য্য করিলে অর্জ্জুনের গৌরব কোথা থাকে? এরূপ সঙ্কট, ক্ষুদ্র কবিকে বুঝাইয়া দিলে তিনি অবশ্য স্থির করিবেন, যে তবে অত হাঙ্গামায় কাজ নাই —কর্ণকে না তুলিলেই ভাল হয়। কাব্যের যে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন-তার ক্ষতি হয় তাহা তিনি বুঝিবেন না—সকল রাজাই যেখানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী লোভে লক্ষ্য বিঁধিতে উঠিতেছেন, সেখানে মহা-বল পরাক্রান্ত কর্ণই যে কেন একা উঠিবেন না, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই।

মহাকবি আশ্চর্য্য কৌশলময়, এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশালী। তিনি অবলীলাক্রমে কর্ণকে লক্ষ্যবিন্ধনে উত্থিত করিলেন, কর্ণের বীর্য্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন, এবং সেই অবসরে, সেই উপ-লক্ষে, সেই একই উপায়ে, আর একটি গুরুতর উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করিলেন। দ্রৌপদীর চরিত্র পাঠকের নিকটে প্রকটিত করিলেন। যেদিন জয়দ্রথ দ্রৌপদীকর্ত্তৃক ভূতলশায়ী হইবে, যে দিন দুর্য্যোধনের সভাতলে দ্যূতজিতা অপমানিতা মহিষী

স্বামী হইতেও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে উন্মুখিনী হইবেন, সে দিন দ্রৌপদীর যে চরিত্র প্রকাশ পাইবে, অদ্য সেই চরিত্রের পরিচয় দিলেন। একটি ক্ষুদ্র কথায় এই সকল উদ্দেশ্য সফল হইল। বলিয়াছি, সেই প্রচণ্ড প্রতাপসমন্বিতা মহাসভায় কুমারী কুসুম শুকাইয়া উঠে। কিন্তু দ্রৌপদী কুমারী, সেই বিষম সভাতলে রাজমণ্ডলী, বীরমণ্ডলী, ঋষিমণ্ডলীমধ্যে, দ্রুপদরাজ তুল্য পিতার ধৃষ্টদ্যুম্নতুল্য ভ্রাতার অপেক্ষা না করিয়া, কর্ণকে বিন্ধনোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, "'আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না।' এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষহাস্তে সূর্য্যসন্দর্শনপূর্ব্বক শরাসন পরিত্যাগ করিলেন।"

এই কথায় যতটা চরিত্র পরিস্ফুট হইল শত পৃষ্ঠা লিখিয়াও ততটা প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এস্থলে কোন বিস্তারিত বর্ণনার প্রয়োজন হইল না—দ্রৌপদীকে তেজস্বিনী বা গর্ব্বিতা বলিয়া ব্যাখ্যাত করিবার আবশ্যকতা হইল না। অথচ রাজদুহিতার দুর্দ্দমনীয় গর্ব্ব নিঃসঙ্কোচে বিস্ফারিত হইল।

ইহার পর দ্যূতক্রীড়ায়,বিজিতা দ্রৌপদীর চরিত্র অবলোকন কর। মহাগর্ব্বিত, তেজস্বী, এবং বলধারী ভীমার্জ্জুন দ্যূতমুখে বিসর্জ্জিত হইয়াও, কোন কথা কহেন নাই, শত্রুর দাসত্ব নিঃশব্দে স্বীকার করিলেন। এস্থলে তাঁহাদিগের অনুগামিনী দাসীর কি করা কর্ত্তব্য? স্বামিকর্ত্তৃক দ্যূতমুখে সমর্পিত হইয়া স্বামিগণের ন্যায় দাসীত্ব স্বীকার করাই আর্য্যনারীর স্বভাব-সিদ্ধ। দ্রৌপদী কি করিলেন? তিনি প্রতিকামীর মুখে দ্যূতবার্ত্তা এবং দুর্য্যোধনের সভায় তাঁহার আহ্বান শুনিয়া বলিলেন,

"হে সূতনন্দন! তুমি সভায় গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি অগ্রে আমাকে কি আপনাকে দ্যূতমুখে

বিসর্জ্জন করিয়াছেন। হে সূতাত্মজ! তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট এই বৃত্তান্ত জানিয়া এস্থানে আগমন পূর্ব্বক আমাকে লইয়া যাইও। ধর্ম্মরাজ কিরূপে পরাজিত হইয়াছেন, জানিয়া আমি তথায় গমন করিব।" দ্রৌপদীর অভিপ্রায়, কূটতর্ক উপস্থিত করিবেন।

দ্রৌপদীর চরিত্রে দুইটি লক্ষণ বিশেষ সুস্পষ্ট—এক ধর্ম্মাচরণ, দ্বিতীয় দর্প। দর্প, ধর্ম্মের কিছু বিরোধী, কিন্তু এই দুইটি লক্ষণের একাধারে সমাবেশ অপ্রকৃত নহে। মহাভারতকার এই দুই লক্ষণ অনেক নায়কে একত্রে সমাবেশ করিয়াছেন; ভীমসেনে, অর্জ্জুনে, অশ্বত্থামায়, এবং সচরাচর ক্ষত্রিয়চরিত্রে এতদুভয়কে মিশ্রিত করিয়াছেন। ভীমসেনে দর্প পূর্ণমাত্রায়, এবং অর্জ্জুনে ও অশ্বত্থামায় অর্দ্ধমাত্রায়, দেখা যায়। দর্প শব্দে এখানে আত্মশ্লাঘাপ্রিয়তা নির্দ্দেশ করিতেছি না; মানসিক তেজস্বিতাই আমাদের নির্দ্দেশ্য। এই তেজস্বিতা দ্রৌপদীতেও পূর্ণমাত্রায় ছিল। অর্জ্জুনে এবং অভিমন্যুতে ইহা আত্মশক্তি নিশ্চয়তায় পরিণত হইয়াছিল; ভীমসেনে ইহা বলবুদ্ধির কারণ হইয়াছিল; কেবল দ্রৌপদীতেই ইহা ধর্ম্মানুরাগ অপেক্ষা প্রবল। নহিলে তিনি স্বয়ম্বর সভাতলে পিতৃসত্যের ব্যতিক্রম করিয়া বলিতেন না যে, "আমি সূতপুত্রকে বিবাহ করিব না।" তা না হইলে দুর্য্যোধনের সভায় স্বামীর পণ ব্যতিক্রম করিয়া কূটপ্রশ্ন করিতেন না। এটি স্বভাবসঙ্গতই হইতেছে, স্ত্রীলোকের গর্ব্ব, সহজে ধর্ম্মকে অতিক্রম করে। এত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে দ্রৌপদীচরিত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

সভাতলে দ্রৌপদীর দর্প ও তেজস্বিতা আরও বর্দ্ধিত হইল। তিনি দুঃশাসনকে বলিলেন, "যদি ইন্দ্রাদি দেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন

না।” স্বামিকুলকে উপলক্ষ করিয়া সর্ব্বসমীপে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, “ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্! ক্ষত্রধর্ম্মজ্ঞগণের চরিত্র একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।” ভীষ্মাদি গুরুজনকে মুখের উপর তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “বুঝিলাম দ্রোণ, ভীষ্ম, ও মহাত্মা বিদুরের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই।” কিন্তু অবলার তেজ কতক্ষণ থাকে! মহাভারতের কবি, মনুষ্যচরিত্র সাগরের তল-পর্য্যন্ত নখদর্পণবৎ দেখিতে পাইতেন। যখন কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিল, দুঃশাসন তাঁহার পরিধেয় আকর্ষণ করিতে গেল, তখন আর দর্প রহিল না—ভয়াধিক্যে হৃদয় দ্রবীভূত হইল। তখন দ্রৌপদী ডাকিতে লাগিলেন, “হা নাথ! হা রমানাথ! হা ব্রজনাথ! হা দুঃখনাশ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি—আমাকে উদ্ধার কর!” এস্থলে কবিত্বের চরমোৎকর্ষ।

বলিয়াছি, যে দ্রৌপদী স্ত্রীজাতি বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে দর্প এত প্রবল, যে তাহাতে সময়ে সময়ে ধর্ম্মজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞানও অসামান্য—যখন তিনি দর্পিতা রাজমহিষী হইয়া না দাঁড়ান, তখন জনমণ্ডলে তাদৃশী ধর্ম্মানু-রাগিণী আছে বোধ হয় না। এই প্রবল ধর্ম্মানুরাগই, প্রবলতর দর্পের মানদণ্ডের স্বরূপ। এই অসামান্য ধর্ম্মানুরাগ, এবং তেজস্বিতার সহিত সেই ধর্ম্মানুরাগের রমণীয় সামঞ্জস্য, ধৃত-রাষ্ট্রের নিকট তাঁহার বরগ্রহণ কালে অতি সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেস্থানটি এত সুন্দর, যে যিনি তাহা শতবার পাঠ করিয়াছেন, তিনি তাহা আর একবার পাঠ করিলেও অসুখী হইবেন না। এজন্য সেই স্থানটি আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

“হিতৈষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে!

তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন হে ভরতকুলপ্রদীপ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্ব্বধর্ম্মযুক্ত শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় দাস না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়, কেন না প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, বিশেষতঃ ভূপতিগণকর্ত্তৃক লালিত, উহার দাসপুত্রতা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমার অভি-লাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে মহারাজ! সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয় নকুল ও সহদেবের দাসত্ব মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন হে নন্দিনি! আমি তোমার প্রার্থনানুরূপ বর প্রদান করিলাম; এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দান দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্ম্মচারিণী আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভগবন্! লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত নহি; যেহেতু, বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া পুনরায় উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়ো-লাভ করিতে পারিবেন।”

এইরূপ ধর্ম্ম ও গর্ব্বের সুসামঞ্জস্যই দ্রৌপদীচরিত্রের রমণী-

রতার প্রধান উপকরণ। যখন জয়দ্রথ তাঁহাকে হরণ মানসে কাম্যকবনে একাকিনী প্রাপ্ত হয়েন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী তাঁহাকে ধর্ম্মাচারসঙ্গত অতিথিসমুচিত সৌজন্যে পরিতৃপ্ত করিতে বিলক্ষণ যত্ন করেন; পরে জয়দ্রথ আপনার দুরভিসন্ধি ব্যক্ত করায়, ব্যাঘ্রীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া আপনার তেজোরাশি প্রকাশ করেন। তাঁহার সেই তেজোগর্ব্ব বচন পরম্পরা পাঠে মন আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে। জয়দ্রথ তাহাতে নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভীমার্জ্জুনের পত্নী, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী তাঁহার বাহুবলে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় মহাবীর সিন্ধু সৌবীরাধিপতি ভূতলে পতিত হয়েন।

পরিশেষে জয়দ্রথ পুনর্ব্বার বল প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে রথে তুলেন; তখন দ্রৌপদী যে আচরণ করিলেন, তাহা নিতান্ত তেজস্বিনী বীরনারীর কার্য্য। তিনি বৃথা বিলাপ ও চীৎকার কিছুই করিলেন না; অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় একবারও অনবধান এবং বিলম্বকারী স্বামিগণের উদ্দেশে ভৎর্সনা করিলেন না; কেবল কুলপুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক জয়দ্রথের রথে আরোহণ করিলেন। পরে যখন জয়দ্রথ দৃশ্যমান পাণ্ডবদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখন তিনি জয়দ্রথের রথস্থা হইয়াও যেরূপ গর্ব্বিত বচনে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অবলীলাক্রমে স্বামীদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধারের যোগ্য।

“ দ্রৌপদী কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে। উহাঁরা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট

থাকিবে না। এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে; আমি ধর্ম্মবোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি; শ্রবণ কর।

যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপানন্দ নামক সুমধুর মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে। যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর; নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত; উনিই আমার পতি, কুরুকুল শ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উহাঁর অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণদান করেন; অতএব তুমি যদি আপনার শ্রেয় ইচ্ছা কর; তাহা হইলে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে, অবিলম্বেই উহাঁর শরণাপন্ন হও।

যিনি শাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত; যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত; আনন ভ্রূকুটীকুটিল ও ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংহত; যিনি মুহুর্মুহু ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন; উনি আমার পতি,মহাবীর বৃকোদর। আয়ানেয় নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্লমনে উহাঁরে বহন করিয়া থাকে। উহাঁর কর্ম্ম সকল অলোকসামান্য এবং উহাঁর ভীম এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে। উহাঁর নিকট অপরাধী হইলে অতি বলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে হয়। ইনি শত্রুতা কদাচ বিস্মৃত হন না এবং শত্রুর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তিলাভ করেন না।

ইহার নাম যশস্বী অর্জ্জুন। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য; ভয়, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসাচারেও নিরত নহেন। ইনি

ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়ার্ত্তের ত্রাতা; ইহাঁর অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে। অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সতত্তই এই প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল; ইনি আমার পতি। ইনি খড়্গযুদ্ধে অদ্বিতীয়; আজি দৈত্যসৈন্য মধ্যবর্ত্তী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রণস্থলে ইহাঁর অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, মতিমান্ ও মনস্বী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর যাঁহাকে সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন দেখিতেছ; উনি আমার পতি, সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব, উহাঁর তুল্য বুদ্ধিমান্ ও বক্তা আর নাই। উনি অনায়াসে প্রাণত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন; তথাপি অধর্ম্ম ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হন না এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহ্য করিতে পারেন না। উনি আর্য্যা কুন্তীর প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।

যেমন অর্ণবমধ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা মকরপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়; এক্ষণে আমি সৈন্যগণমধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশপরবশ হইয়া যাঁহাদিগকে এইরূপ অবমাননা করিতেছ; সেই পাণ্ডবেরা তোমারে অবিলম্বে ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন কিন্তু অদ্য যদি তুমি ইহাদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও; তাহা হইলে তোমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে; সন্দেহ নাই।"*)

* এই প্রবন্ধে যাহা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে।

সেকাল আর একাল।*

জগদীশ্বর কৃপায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক বাঙ্গালি নামে এক অদ্ভুত জন্তু এই জগতে দেখা দিয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে এই জন্তু বাহ্যতঃ মনুষ্য-লক্ষণাক্রান্ত; হস্তে পদে পাঁচ পাঁচ অঙ্গুলি, লাঙ্গুল নাই, এবং অস্থি ও মস্তিষ্ক, "বাইমেনা" জাতির সদৃশ বটে। তবে অন্তঃস্বভাব সম্বন্ধে, সেরূপ নিশ্চয়তা এখনও হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, ইহারা অন্তঃসম্বন্ধেও মনুষ্য বটে,কেহ কেহ বলেন, ইহারা বাহিরে মনুষ্য, এবং অন্তরে পশু। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু ১৭৯৪ শকের চৈত্র মাসে বক্তৃতা করেন। এক্ষণে তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। তিনি এ বক্তৃতায় পশুপক্ষই সমর্থন করিয়াছেন।

আমরা কোন্ মতাবলম্বী? আমরাও বাঙ্গালির পশুত্ব বাদী। আমরা ইংরেজি সম্বাদপত্র হইতে এ পশুতত্ত্ব অভ্যাস করিয়াছি। কোন২ তাম্রশ্মশ্রু ঋষির মত এই যে যেমন বিধাতা ত্রিলোকের সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য তিল তিল সংগ্রহ করিয়া তিলোত্তমার সৃজন করিয়াছিলেন; সেইরূপ পশুবৃত্তির তিল তিল করিয়া সংগ্রহ পূর্ব্বক এই অপূর্ব্ব নব্য বাঙ্গালিচরিত্র সৃজন করিয়াছেন। শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা, এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জন,—এই সকল একত্র করিয়া, দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত, এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল, নব্য বাঙ্গালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন। যেমন সুন্দরীমণ্ডলে তিলোত্তমা, গ্রন্থমধ্যে রিচার্ডসন্স সিলেক্‌সন্স, যেমন পোষাকের মধ্যে ফকিরের জামা, মদ্যের মধ্যে পঞ্চ,

---

* সেকাল আর একাল। শ্রীরাজনারায়ণ বসু প্রণীত।

খাদ্যের মধ্যে খিচুড়ি, তেমনি মনুষ্যের মধ্যে নব্য বাঙ্গালি। যেমন ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন করিলে চন্দ্র উঠিয়া জগৎ আলো করিয়াছিল—তেমনি পশুচরিত্র সাগর মন্থন করিয়া, এই অনিন্দনীয় বাবু চাঁদ উঠিয়া ভারতবর্ষ আলো করিতেছেন। রাজনারায়ণ বাবুর ন্যায় যে সকল অমৃতলুব্ধ লোক রাহু হইয়া এই কলঙ্কশূন্য চাঁদকে গ্রাস করিতে যান, আমরা তাঁহাদের নিন্দা করি। বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বাবুকে বলি, যে আপনিই এই গ্রন্থমধ্যে গোমাংসভোজন নিষেধ করিয়াছেন, তবে বাঙ্গালির মুণ্ড খাইতে বসিয়াছেন কেন?—গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট? গোরুও যেমন উপকারী, নব্য বাঙ্গালিও সেইরূপ। ইহারা সম্বাদ পত্র রূপ, ভাণ্ডং সুস্বাদু দুগ্ধ দিতেছে; চাকরি লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, জীবনক্ষেত্র কর্ষণ পূর্ব্বক ইংরেজ চাষার ফশলের যোগাড় করিয়া দিতেছে; বিদ্যার ছালা পিঠে করিয়া কালেজ হইতে ছাপাখানায় আনিয়া ফেলিয়া, চিনির বলদের নাম রাখিতেছে; সমাজ সংস্কারের গাড়িতে বিলাতি মাল বোঝাই দিয়া, রসের বাজারে চোলাই করিতেছে; এবং দেশহিতের ঘানিগাছে স্বার্থশর্ষপ পেষণ করিয়া, যশের তেল বাহির করিতেছে। এতগুণের গোরুকে কি বধ করিতে আছে?

যিনি বাঙ্গালির যত নিন্দা করেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। রাজনারায়ণ বাবুও বাঙ্গালির যত নিন্দা করিয়াছেন, বাঙ্গালি তত নিন্দনীয় নহে। অনেক স্বদেশবৎসল যে অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করেন, রাজনারায়ণ বাবুও সেই অভিপ্রায়ে বাঙ্গালির নিন্দা করিয়াছেন—বাঙ্গালির হিতার্থ। সে কালে আর এ কালে নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—একালের দোষনির্ব্বাচনই তাঁহার উদ্দেশ্য। একালের গুণগুলির প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টিক্ষেপ করেন নাই—করাও

নিষ্প্রয়োজন, কেন না আমরা আপনাদিগের গুণের প্রতি পল-কের জন্য সন্দেহযুক্ত নহি।

নব্য বাঙ্গালির অনেক দোষ। কিন্তু সকল দোষের মধ্যে, অনুকরণানুরাগ সর্ব্ববাদিসম্মত। কি ইংরেজ কি বাঙ্গালি সক-লেই ইহার জন্য বাঙ্গালি জাতিকে অহরহ তিরস্কৃত করিতেছেন। তদ্বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করি-বার আবশ্যকতা নাই—সে সকল কথা আজকালি সকলেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা সে সকল কথা স্বীকার করি. এবং ইহাও স্বীকার করি, যে রাজনারায়ণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক গুলিই সঙ্গত। কিন্তু অনুকরণসম্বন্ধে দুই একটি সাধারণ ভ্রম আছে।

অনুকরণ মাত্র কি দুষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই। যেমন শিশু বয়ঃপ্রাপ্তের বাক্যানুকরণ করিয়া কথা কহিতে শিখে, যেমন সে বয়ঃপ্রাপ্তের কার্য্য সকল দেখিয়া কার্য্য করিতে শিখে, অসভ্য এবং অশিক্ষিত জাতি সেইরূপ সভ্য এবং শিক্ষিতজাতির অনু-করণ করিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অতএব বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিবে, ইহা সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ। সত্য বটে, আদিম সভ্যজাতি বিনানুকরণে স্বতঃশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াছিলেন; প্রাচীন ভারতীয় ও মিসরীয় সভ্যতা কাহারও অনুকরণলব্ধ নহে। কিন্তু যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বজাতীয় সভ্যতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা কিসের ফল? তাহাও রোম ও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। রোমক সভ্যতাও যুনানী সভ্যতার অনুকরণের ফল। যে পরিমাণে বাঙ্গালি, ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, পুরাবৃত্তজ্ঞ জানেন যে ইউরো-

পীয়েরা প্রথমাবস্থাতে তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে যুনানীয়ের বিশেষতঃ রোমকীয়ের অনুকরণ করেন নাই। প্রথমাবস্থাতে অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এখন এ উচ্চসোপানে দাঁড়াইয়াছেন। শৈশবে পরের হাতে ধরিয়া যে জলে নামিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই সাঁতার দিতে শিখে নাই; কেন না ইহ জন্মে তাহার জলে নামাই হইল না। শিক্ষকের লিখিত আদর্শ দেখিয়া যে প্রথমে লিখিতে না শিখিয়াছে, সে কখনই লিখিতে শিখে নাই। বাঙ্গালি যে ইংরেজের অনুকরণ করিতেছে, ইহাই বাঙ্গালির ভরসা।

তবে লোকের বিশ্বাস এই, যে অনুকরণের ফলে কখন প্রথম শ্রেণীর উৎকর্ষ প্রাপ্তি হয় না। কিসে জানিলে?

প্রথম, সাহিত্য সম্বন্ধে দেখ। পৃথিবীর কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর কাব্য, কেবল অনুকরণ মাত্র। ড্রাইডেন এবং বোয়ালোর অনুকারী পোপ, পোপের অনুকারী জন্‌সন্, এইরূপ ক্ষুদ্র২ লেখকদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমরা এ কথা সপ্রমাণ করিতে চাহি না। বর্জ্জিলের মহাকাব্য, হোমরের প্রসিদ্ধ মহাকাব্যের অনুকরণ। সমুদায় রোমকসাহিত্য, যুনানীয় সাহিত্যের অনুকরণ। যে রোমকসাহিত্য বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি, তাহা অনুকরণ মাত্র। কিন্তু বিদেশীয় উদাহরণ দূরে থাকুক। আমাদিগের স্বদেশে দুইখানি মহাকাব্য আছে—তাহাকে মহাকাব্য বলে না, গৌরবার্থ ইতিহাস বলে—তাহা পৃথিবীর সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। গুণে উভয়ে প্রায় তুল্য; অল্প তারতম্য। একখানি আর একখানির অনুকরণ।

মহাভারত যে রামায়ণের পরকালে প্রণীত, তাহা হুইলর সাহেব ভিন্ন বোধ হয় আর কেহই সহজ অবস্থায় অস্বীকার করিবেন না। অন্যান্য অনুকৃত এবং অনুকরণের নায়ক সকলে

যতটা প্রভেদ দেখা যায়, রামে ও যুধিষ্ঠিরে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রভেদ নহে। রামায়ণের অমিতবলধারী বীর,জিতেন্দ্রিয়, ভ্রাতৃবৎসল,লক্ষণ মহাভারতে অর্জ্জুনে পরিণত হইয়াছেন, এবং ভরত শত্রুঘ্ন নকুল সহদেব হইয়াছেন। ভীম, নূতন সৃষ্টি,তবে কুম্ভকর্ণের একটু ছায়ায় দাঁড়াইয়াছেন। রামায়ণে রাবণ, মহাভারতে দুর্য্যোধন; রামায়ণে বিভীষণ, মহাভারতে বিদুর; অভিমন্যু, ইন্দ্রজিতের অস্থিমজ্জা লইয়া গঠিত হইয়াছে। এদিকে রাম ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী; যুধিষ্ঠিরও ভ্রাতা ও পত্নী সহিত বনবাসী। উভয়েই রাজ্যচ্যুত। একজনের পত্নী অপহৃতা, আর একজনের পত্নী সভামধ্যে অপমানিতা; উভয় মহাকাব্যের সারভূত সমরানলে সেই অগ্নি জলন্ত; একে স্পষ্টতঃ, অপরে অস্পষ্টতঃ। উভয় কাব্যের উপন্যাস ভাগ এই যে যুবরাজ রাজ্যচ্যুত হইয়া, ভ্রাতা ও পত্নী সহ বনবাসী, পরে সমরে প্রবৃত্ত, পরে সমরবিজয়ী হইয়া পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে স্থাপিত। ক্ষুদ্র২ ঘটনাতেই সেই সাদৃশ্য আছে; কুশীলবের পালা মণিপুরে বভ্রুবাহন কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছে; মিথিলায় ধনুর্ভঙ্গ, পাঞ্চালে মৎস্যবিন্ধনে পরিণত হইয়াছে; দশরথকৃত পাপে এবং পাণ্ডুকৃত পাপে বিলক্ষণ ঐক্য আছে। মহাভারতকে রামায়ণের অনুকরণ বলিতে ইচ্ছা না হয়, না বলুন; কিন্তু অনুকরণীয়ে এবং অনুকৃতে ইহার অপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অতি বিরল। কিন্তুমহাভারত অনুকরণ হইয়াও কাব্যমধ্যে পৃথিবীতে অন্যত্র অতুল—একা রামায়ণই তাহার তুলনীয়। অতএব অনুকরণ মাত্র হেয় নহে।

পরে, সমাজ সম্বন্ধে দেখ। যখন রোমকেরা যুনানীয় সভ্যতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহারা কায়মনোবাক্যে যুনানীয়দিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফল, কিকি-

রোর বাগ্মিতা, তাসিতসের ইতিবৃত্তগ্রন্থ, বর্জ্জিলের মহাকাব্য, প্লতস ও টেবেন্সের নাটক, হরেস ও ওবিদের গীতিকাব্য, পেপিনিয়নের ব্যবস্থা, সেনেকার ধর্ম্মনীতি, আন্তনৈনদিগের রাজধর্ম্ম, লুকালসের ভোগাসক্তি, জনসাধারণের ঐশ্বর্য্য, এবং সম্রাট্‌গণের স্থাপত্য কীর্ত্তি। আধুনিক ইউরোপীয় দিগের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; ইতালীয়, ফরাসি-সাহিত্য, গ্রীক ও রোমীয় সাহিত্যের অনুকরণ; ইউরোপীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র, রোমক-ব্যবস্থা শাস্ত্রের অনুকরণ; ইউরোপীয় শাসন প্রণালী রোমকীয়ের অনুকরণ। কোথাও সেই ইম্পিরেটর, কোথাও সেই সেনেট কোথাও সেই প্লেবের শ্রেণী কোথাও ফোরম, কোথাও সেই মিউনিসিপিয়ম্। আধুনিক ইউরোপীয় স্থাপত্য ও চিত্রবিদ্যাও যুনানী ও রোমক মূলবিশিষ্ট। এই সকলই প্রথমে অনুকরণ মাত্রই ছিল; এক্ষণে অনুকরণাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পৃথগ্‌ভাবাপন্ন ও উন্নত হইয়াছে। প্রতিভা থাকিলেই এরূপ ঘটে, প্রথম অনুকরণ মাত্র হয়; পরে অভ্যাসে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।

তবে প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য্য হয় বটে। যাহার যে বিষয়ে নৈসর্গিক শক্তি নাই, যে চিরকালই অনুকারী থাকে তাহার স্বাতন্ত্র্য কখন দেখা যায় না। ইউরোপীয় নাটক ইহার বিশিষ্ট উদাহরণ। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেরই নাটক আদৌ যুনানী নাটকের অনুকরণ। কিন্তু প্রতিভার গুণে স্পেনীয় এবং ইংলণ্ডীয় নাটক শীঘ্রই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এবং ইংলণ্ড এ বিষয়ে গ্রীসের সমকক্ষ হইল। এদিকে,

এতদ্বিষয়ে স্বাভাবিক শক্তিশূন্য রোমীয়, ইতালীয়, ফরাসি এবং জর্ম্মনীয়গণ, অনুকারীই রহিলেন। অনেকেই বলেন, যে শেষোক্ত জাতি সকলের নাটকের অপেক্ষাকৃত অমুৎকর্ষ তাঁহাদিগের অনুচিকীর্ষার ফল। এটি ভ্রম। ইহা নৈসর্গিক ক্ষমতার অপ্রতুলেরই ফল। অনুচিকীর্ষাও সেই অপ্রতুলের ফল। অনুচিকীর্ষাও কার্য্য, কারণ নহে।

অনুকরণ যে গালি বলিয়া আজি কালি পরিচিত হইয়াছে, তাহার কারণ প্রতিভাশূন্য ব্যক্তির অনুকরণে প্রবৃত্তি। অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই; একে মন্দ তাহাতে অনুকরণ। নচেৎ অনুকরণ মাত্র ঘৃণ্য নহে; এবং বাঙ্গালির বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা দোষের নহে। বরং এরূপ অনুকরণই স্বভাবসিদ্ধ। ইহাতে যে বাঙ্গালির স্বভাবের কিছু বিশেষ দোষ আছে এমন বোধ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা কঠিন। ইহা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দোষ বা গুণ। যখন উৎকৃষ্টে এবং অপকৃষ্টে একত্রিত হয়, তখন অপকৃষ্ট স্বভাবতঃই উৎকৃষ্টের সমান হইতে চাহে। সমান হইবার উপায় কি? উপায়, উৎকৃষ্ট যেরূপ করে, সেইরূপ কর, সেইরূপ হইবে। তাহাকেই অনুকরণ বলে। বাঙ্গালি দেখে, ইংরেজ, সভ্যতায়, শিক্ষায়, বলে, ঐশ্বর্য্যে, সুখে, সর্ব্বাংশে বাঙ্গালি হইতে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালি কেন না ইংরেজের মত হইতে চাহিবে? কিন্তু কি প্রকারে সেরূপ হইবে? বাঙ্গালি মনে করে, ইংরেজ যাহা যাহা করে, সেইরূপ সেইরূপ করিলে, ইংরেজের মত সভ্য, শিক্ষিত, সম্পন্ন, সুখী হইব। অন্য যে কোন জাতি হউক না কেন, ঐ অবস্থাপন্ন হইলে ঐ রূপ করিত। বাঙ্গালির স্বভাবের দোষে এ অনুকরণ প্রবৃত্তি নহে। অন্ততঃ বাঙ্গালির তিনটি প্রধান জাতি—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, আর্য্যবংশসম্ভূত; আর্য্য

শোণিত তাঁহাদের শরীরে অদ্যাপি বহিতেছে ; বাঙ্গালি কখনই বানরের ন্যায় কেবল অনুকরণের জন্যই অনুকরণপ্রিয় হইতে পারে না। এ অনুকরণ স্বাভাবিক, এবং পরিণামে মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে। যাঁহারা আমাদিগের কৃত ইংরেজের আহার ও পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া রাগ করেন তাঁহারা ইংরেজকৃত ফরাশীদিগের আহার পরিচ্ছদের অনুকরণ দেখিয়া কি বলিবেন? এ বিষয়ে বাঙ্গালির অপেক্ষা ইংরেজেরা অল্পাংশে অনুকারী? আমরা অনুকরণ করি, জাতীয় প্রভুর ;—ইংরেজেরা অনুকরণ করেন—কাহার?

ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, যে বাঙ্গালি যে পরিমাণে অনুকরণে প্রবৃত্ত, ততটা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে, বাঙ্গালির মধ্যে প্রতিভাশূন্য অনুকারীরই বাহুল্য ; এবং তাঁহাদিগকে প্রায় গুণভাগের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হইয়া দোষভাগের অনুকরণেই প্রবৃত্ত দেখা যায়। এইটি মহা দুঃখ। বাঙ্গালি গুণের অনুকরণে তত পটু নহে ; দোষের অনুকরণে ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয়। এই জন্যই আমরা বাঙ্গালির অনুকরণপ্রবৃত্তিকে গালি পাড়ি,এবং এই জন্যই রাজনারায়ণ বাবু যাহা২ বলিয়াছেন, তাহার অনেক গুলিকে যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

যে খানে অনুকারী প্রতিভাশালী সে খানেও অনুকরণের দুইটি মহৎ দোষ আছে। একটি বৈচিত্রের বিঘ্ন। এ সংসারে একটি প্রধান সুখ, বৈচিত্র ঘটিত। জগতীতলস্থ সর্ব্ব পদার্থ যদি এক বর্ণের হইত তবে জগৎ কি এত সুখদৃশ্য হইত? সকল শব্দ যদি এক প্রকার হইত—মনে কর কোকিলের স্বরের ন্যায় রব ভিন্ন পৃথিবীতে অন্য কোন প্রকার শব্দ না থাকিত, তবে কি শব্দ সকলের কর্ণজ্বালাকর হইত না? আমরা সেরূপ স্বভাব পাইলে, না হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে প্রকৃতি

লইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে বৈচিত্রেই সুখ। অনুকরণে এই সুখের ধ্বংস হয়। মাকবেথ উৎকৃষ্ট নাটক, কিন্তু পৃথিবীর সকল নাটক মাকবেথের অনুকরণে লিখিত হইলে, নাটকে আর কি সুখ থাকিত? সকল মহাকাব্য রঘুবংশের আদর্শে লিখিত হইলে, কে আর কাব্য পড়িত?

দ্বিতীয়, সকল বিষয়েই যত্নপৌনঃপুন্যে উৎকর্ষের সম্ভাবনা। কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যের অনুকরণ মাত্র হইলে, চেষ্টা কোন প্রকার নূতন পথে যায় না; সুতরাং কাব্যের উন্নতি ঘটে না। তখন ধারাবাহিকতা প্রাপ্ত হইতে হয়। ইহা কি শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞান, কি সামাজিক কার্য্য, কি মানসিক অভ্যাস, সকল সম্বন্ধেই সত্য।

এই তত্ত্বের অন্তর্গত একটি গুরুতর তত্ত্ব আছে—স্বানুবর্ত্তিতার বিনাশ। স্বানুবর্ত্তিতা কি, তাহা বিস্তারিত বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। মিল প্রণীত স্বাধীনতাবিষয়ক গ্রন্থ* ভবিষ্যতে মানব সমাজ শাস্ত্রের মূল স্বরূপ পরিণাম লাভ করিবার সম্ভাবনা; এবং আমাদিগের বিবেচনায় সমাজ নীতির সকল তত্ত্বই তৎপ্রণীত নীতি সূত্রের সাহায্যে পর্য্যবেক্ষিত হওয়া উচিত। সেই নীতিসূত্রের সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন হয়, যে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলেরই সামকালিক যথোচিত স্ফূর্ত্তি এবং উন্নতি মনুষ্যদেহ ধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে যাহাতে কতকগুলির অধিকতর পরিপুষ্টি, এবং কতকগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য জন্মে, তাহা মনুষ্যের অনিষ্টকর। মনুষ্য অনেক, এবং একজন মনুষ্যের সুখও বহুবিধ। তত্তাবৎ সাধনের জন্য বহুবিধ ভিন্ন২ প্রকারের কার্য্যের আবশ্যকতা। ভিন্ন২ প্রকারের কার্য্য ভিন্ন২ প্রকৃতির লোকের দ্বারা ভিন্ন সম্পন্ন

* On Liberty.

হইতে পারে না। এক শ্রেণীর চরিত্রের লোকের দ্বারা, বহু প্রকারের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। অতএব সংসারে চরিত্র বৈচিত্র, কার্য্য বৈচিত্র, এবং প্রবৃত্তির বৈচিত্র প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত সমাজের সকল বিষয়ে মঙ্গল নাই। অনুকরণ প্রবৃত্তিতে ইহাই ঘটে, যে, অনুকারীর চরিত্র, তাহার প্রবৃত্তি, এবং তাহার কার্য্য, অনুকরণীয়ের ন্যায় হয়, পথান্তরে গমন করিতে পারে না। যখন সমাজস্থ সকলেই বা অধিকাংশ লোক, বা কার্য্যক্ষম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ, একই আদর্শের অনুকারী হয়েন, তখন এই বৈচিত্র হানি অতি গুরুতর হইয়া উঠে। মনুষ্য চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ঘটে না; সর্ব্বপ্রকারের মনোবৃত্তি সকলের মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারের কার্য্য সম্পাদিত হয় না, মনুষ্যের কপালে সকল প্রকার সুখ ঘটে না—মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে, সমাজ অসম্পূর্ণ থাকে, মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা যে কয়টি কথা বলিয়াছি, তাহাতে নিম্নলিখিত তত্ত্ব সকলের উপলব্ধি হইতে পারে—

১। সামাজিক সভ্যতার আদি দুই প্রকার; কোন২ সমাজ স্বতঃ সভ্য হয়, কোন২ সমাজ অন্যত্র হইতে শিক্ষা লাভ করে। প্রথমোক্ত সভ্যতালাভ বহুকাল সাপেক্ষ; দ্বিতীয়োক্ত আশু সম্পন্ন হয়।

২। যখন কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি, অধিকতর সভ্যজাতির সংস্পর্শ লাভ করে, তখন দ্বিতীয় পথে সভ্যতা অতি দ্রুতগতিতে আসিতে থাকে। সেস্থলে সামাজিক গতি এইরূপ হয়, যে অপেক্ষাকৃত অসভ্য সমাজ সভ্যতর সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম।

৩। অতএব বঙ্গীয় সমাজের দৃশ্যমান অনুকরণ প্রবৃত্তি অস্বাভাবিক বা বাঙ্গালির চরিত্রদোষজনিত নহে।

৪। অনুকরণ মাত্রই অনিষ্টকারী নহে, কখনং তাহাতে গুরুতর সুফলও জন্মে; প্রথমাবস্থায় অনুকরণ, পরে স্বাতন্ত্র্য আপনিই আসে। বঙ্গীয় সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিলে, এই অনুকরণ প্রবৃত্তি যে ভাল নহে, এমত নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। ইহাতে ভরসার স্থলও আছে।

৫। তবে অনুকরণে গুরুতর কুফলও আছে। উপযুক্ত কাল উত্তীর্ণ হইলেও অনুকরণ প্রবৃত্তি বলবতী থাকিলে অথবা অনুকরণের যথার্থ সময়েই অনুকরণ প্রবৃত্তি অব্যবহিতরূপে স্ফূর্ত্তি পাইলে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা।

প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দা।

উভয়েই ঋষিকন্যা; প্রস্পেরো ও বিশ্বামিত্র উভয়েই রাজর্ষি। উভয়েই ঋষিকন্যা বলিয়া, অমানুষিক সাহায্যপ্রাপ্ত। মিরন্দা এরিয়লরক্ষিতা, শকুন্তলা অপ্সরোরক্ষিতা।

উভয়েই ঋষিপালিতা। দুইটিই বনলতা—দুইটিরই সৌন্দর্য্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। শকুন্তলাকে দেখিয়া, রাজাবরোধবাসিনীগণের ম্লানীভূত রূপলাবণ্য দুষ্মন্তের স্মরণ পথে আসিল;

শুদ্ধান্তদুর্লভমিদংবপু রাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈ রুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

ফর্দিনন্দও মিরন্দাকে দেখিয়া সেইরূপ ভাবিলেন,

Full many a lady
I have eyed with bsst regard,—and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too diligent ear: for several virtues
Have I like several women ;
————————but you, O you
So perfect and so peerless, are created
Of every creature's best!

উভয়েই অরণ্যমধ্যে প্রতিপালিতা; সরলতার যে কিছু মোহমন্ত্র আছে, উভয়েই তাহাতে সিদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যালয়ে বাস করিয়া,সুন্দর, সরল, বিশুদ্ধ রমণীপ্রকৃতি, বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়—কে আমায় ভাল বাসিবে, কে আমায় সুন্দর বলিবে, কেমন করিয়া পুরুষ জয় করিব, এই সকল কামনায়, নানা বিলাস বিভ্রমাদিতে, মেঘবিলুপ্ত চন্দ্রমাবৎ, তাহার মাধুর্য্য কালিমাপ্রাপ্ত হয়। শকুন্তলা এবং মিরন্দায় এই কালিমা নাই, কেননা তাঁহারা লোকালয়ে প্রতিপালিতা নহেন। শকুন্তলা বল্কল পরিধান করিয়া, ক্ষুদ্র কলসী হস্তে আলবালে জলসিঞ্চন করিয়া দিনপাত করিয়াছেন—সিঞ্চিত জলকণাবিধৌত নব মল্লিকার মত নিজেও শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, প্রফুল্ল, দিগন্তসুগন্ধবিকীর্ণকারিণী। তাঁহার ভগিনীস্নেহ, নবমল্লিকার উপর; ভ্রাতৃস্নেহ, সহকারের উপর; পুত্রস্নেহ, মাতৃহীন হরিণশিশুর উপর; পতিগৃহ গমন কালে ইহাদিগের কাছে বিদায় হইতে গিয়া, শকুন্তলা অশ্রুমুখী, কাতরা, বিবশা। শকুন্তলার কথোপকথন তাহাদিগের সঙ্গে; কোন বৃক্ষের সঙ্গে ব্যঙ্গ, কোন বৃক্ষকে আদর, কোন লতার পরিণয় সম্পাদন করিয়া শকুন্তলা সুখী। কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে

লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্‌গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে, তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেই নাই। প্রথম ফর্দিনন্দকে দেখিয়া মিরন্দা বুঝিতেই পারিল না যে, কি এ?

Lord! how it looks about! Believe me Sir,
It carries a brave form;—but 'tis a spirit.

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই। পিতার সম্মুখে ফর্দিনন্দের রূপের প্রশংসায় কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই—অন্যে যেমন কোন চিত্রাদির প্রশংসা করে, এ তেমনি প্রশংসা;

I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ever saw so noble.

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই, এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক। যখন পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিরন্দা বলিতেছে,

O dear father
Make not rash a trial of him, for
He's gentle, and not fearful.

যখন পিতৃমুখে ফর্দিনন্দের রূপের নিন্দা শুনিয়া মিরন্দা বলিল,

My affections
Are then most humble; I have no ambitions
To see a goodlier man.

তখন আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।

যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল; কেন না শৈশবের পর পিতা ও কালিবন ভিন্ন আর কোন পুরুষকে তিনি কখন দেখেন নাই। শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবন মধ্যে—এক স্থানে কণ্বের তপোবন—অপর স্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই, অথচ একজনে দুইটি চিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা, সমাজ-প্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব, তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক্ পৃথক্ কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। দুষ্মন্তকে দেখিয়াই শকুন্তলা প্রণয়াশক্তা; কিন্তু দুষ্মন্তের কথা দূরে থাক্, সখীদ্বয় যত দিন না তাঁহাকে ক্লিষ্টা দেখিয়া, সকল কথা অনুভবে বুঝিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কথা বাহির করিয়া লইল, ততদিন তাহাদের সম্মুখেও শকুন্তলা এই নূতন বিকারের একটি কথাও বলেন নাই, কেবল লক্ষণেই সে ভাব ব্যক্ত—

স্নিগ্ধং বীক্ষিতমন্যতোপি নয়নে যৎ প্রেরয়ন্ত্যা তয়া,
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি তৎ সাসূয়মুক্তা সখী,
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো! কামঃ স্বতাং পশ্যতি ॥

শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া যাইতে গেলে গাছে তাঁহার বল্কল বাঁধিয়া যায়, পদে কুশাঙ্কুর বিঁধে। কিন্তু মিরন্দার সে সকলের প্রয়োজন নাই—মিরন্দা সে সকল জানে না; প্রথম সন্দর্শন কালে মিরন্দা অসঙ্কুচিত চিত্তে পিতৃসমক্ষে আপন প্রণয় ব্যক্ত করিলেন,

This
Is the third man I e'er saw; the first
That e'er I sighed for.

এবং পিতাকে ফর্দিনন্দের পীড়নে উদ্যত দেখিয়া, ফর্দিনন্দকে আপনার প্রিয়জন বলিয়া, পিতার দয়ার উদ্রেকের যত্ন করিলেন। প্রথম অবসরেই ফর্দিনন্দকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

দুষ্মন্তের সঙ্গে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়সম্ভাষণ, এক প্রকার লুকাচুরি খেলা। "সখি, রাজাকে ধরিয়া রাখিস্ কেন?"—"তবে, আমি উঠিয়া যাই"—"আমি এই গাছের আড়ালে লুকাই"—শকুন্তলার এ সকল "বাহানা" আছে; মিরন্দার সে সকল নাই। এ সকল লজ্জাশীলা কুলবালার বিহিত, কিন্তু মিরন্দা লজ্জাশীলা কুলবালা নহে—মিরন্দা বনের পাখী—প্রভাতারুণোদয়ে গাইয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না; বৃক্ষের ফুল, সন্ধ্যার বাতাস পাইলে মুখ ফুটাইয়া ফুটিয়া উঠিতে তাহার লজ্জা করে না। নায়ককে পাইয়াই, মিরন্দার বলিতে লজ্জা করে না যে—

By my modesty,
The jewel in my dower—I would not wish
Any companion in the world but you;

Nor can imagination from a shape
Besides yourself, to like of.

পুনশ্চঃ

Hence bashful cunning!
—And prompt me, plain and holy innocence.
I am your wife, if you will marry me.
—If not, I die your maid; to be your fellow
You may deny me, but I will be your servant
Whether you will or no.

আমাদিগের ইচ্ছা ছিল, যে মিরন্দা ফর্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধৃত করি, কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। সকলেরই ঘরে সেক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূলগ্রন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন। দেখিবেন উদ্যানমধ্যে রোমিও জুলিয়েটের যে প্রণয় সম্ভাষণ জগতে বিখ্যাত, এবং পূর্ব্বতন কালেজের ছাত্রমাত্রের কণ্ঠস্থ, ইহা কোন অংশে তদপেক্ষা ন্যূনকল্প নহে। যে ভাবে জুলিয়েট বলিয়াছিলেন, যে "আমার দান সাগরতুল্য অসীম, আমার ভালবাসা সেই সাগরতুল্য গভীর," মিরন্দাও এই স্থলে সেই মহান্ চিত্তভাবে পরিপ্লুত। ইহার অনুরূপ অবস্থায়, লতামণ্ডপতলে, দুষ্মন্ত শকুন্তলায় যে আলাপ,—যে আলাপে শকুন্তলা চিরবদ্ধ হৃদয়কোরক প্রথম অভিমত সূর্য্যসমীপে ফুটাইয়া হাসিল—সে আলাপে তত গৌরব নাই—মানবচরিত্রের কূলপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রঘাতী সেরূপ টল টল চঞ্চল বীচিমালা তাহার হৃদয়মধ্যে লক্ষিত হয় না। যাহা বলিয়াছি, তাই—কেবল, ছি ছি, কেবল যাই যাই, কেবল লুকাচুরি—একটু একটু চাতুরী আছে—যথা "অন্ধপধে সুমরিঅ এদস্স হথত্তংসিণো মিণাল বলঅস্স কদে পড়িণিবুত্তহ্মি।" ইত্যাদি। একটু অগ্রগামিণীত্ব আছে, যথা দুষ্মন্তের মুখে

"নহু কমলস্ত মধুকরঃ সন্তুষ্যতি গন্ধমাত্রেণ।" এই কথা শুনিয়া শকুন্তলার জিজ্ঞাসা, "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" —এই সকল ছাড়া আর বড় কিছুই নাই। ইহা কবির দোষ নহে—বরং কবির গুণ। দুষ্মন্তের চরিত্র গৌরবে ক্ষুদ্রা শকুন্তলা এখানে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফর্দ্দিনন্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য, অকৃতকীর্ত্তি—অপ্রথিতযশাঃ কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে? দুষ্মন্ত মহাবৃক্ষের বৃহচ্ছায়া এখানে শকুন্তলা কলিকাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—সে ভাল করিয়া মুখ তুলিয়া ফুটিতে পারিতেছে না। এ প্রণয় সম্ভাষণ প্রণয় সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেমকরা রূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্তমাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাতে ফুটিবে কি?

যিনি এ কথাগুলি স্মরণ না রাখিবেন তিনি শকুন্তলা চরিত্র বুঝিতে পারিবেন না; যে জলনিসেকে মিরন্দা ও জুলিয়েট ফুটিল, সে জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটিল না; প্রণয়াসক্তা শকুন্তলায় বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখিলাম; কিন্তু রমণীর গাম্ভীর্য্য; রমণীর স্নেহ কই? ইহার কারণ কেহ কেহ বলিবেন, লোকাচারের ভিন্নতা; দেশভেদ। বস্তুতঃ তাহা নহে। দেশী কুলবধূ বলিয়া শকুন্তলা লজ্জায় ভাঙ্গিয়া পড়িল,—আর মিরন্দা বা জুলিয়েট বেহায়া বিলাতী মেয়ে বলিয়া মনের গ্রন্থি খুলিয়া দিল, এমত নহে। ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে,দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে। বরং বলিতে গেলে—তিন জনের মধ্যে শকুন্তলাকেই

বেহায়া বলিতে হয় "অসন্তোসে উণ কিং করেদি?" তাহার প্রমাণ। যে শকুন্তলা, ইহার কয় মাস পরে, পৌরবের সভাতলে দাঁড়াইয়া দুষ্মন্তকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল "অনার্য্য! আপন হৃদয়ের অনুমানে সকলকে দেখ?"—সে শকুন্তলা যে, লতামণ্ডপে বালিকাই রহিল, তাহার কারণ কুলকন্যাসুলভ লজ্জা নহে। তাহার কারণ—দুষ্মন্তের চরিত্রের বিস্তার। যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, রাজমহিষী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং তখন শকুন্তলা রমণী; এখানে তপোবনে,—তপস্বিকন্যা, রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী,—এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র। শকুন্তলার কবি যে টেম্পেষ্টের কবি হইতে হীনপ্রভ নহেন, ইহাই দেখাইবার জন্য এস্থলে আয়াস স্বীকার করিলাম।

দ্বিতীয় শকুন্তলা ও দেসদিমোনা।

শকুন্তলার সঙ্গে মিরন্দার তুলনা করা গেল—কিন্তু ইহাও দেখান গিয়াছে, যে শকুন্তলা ঠিক্ মিরন্দা নহে। কিন্তু মিরন্দার সহিত তুলনা করিলে শকুন্তলা চরিত্রের একভাগ বুঝা যায়। শকুন্তলা চরিত্রের আর একভাগ বুঝিতে বাঁকি আছে। দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনা করিয়া সেভাগ বুঝাইব ইচ্ছা আছে।

শকুন্তলা এবং দেসদিমোনা, দুই জনে পরস্পর তুলনীয়া, এবং অতুলনীয়া। তুলনীয়া কেননা উভয়েই গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। গোতমী শকুন্তলা সম্বন্ধে দুষ্মন্তকে যাহা বলিয়াছেন, ওথেলোকে লক্ষ্য করিয়া দেসদিমোনা সম্বন্ধে তাহা বলা যাইতে পারে—

ণাবেক্খিদো গুরুঅণো ইমিএ ণ তুএবি পুচ্ছিদো বন্ধু।
একক্কং এব্ব চরিএ কিংভণদু একংএক্কস্স॥

তুলনীয়া, কেননা উভয়েই বীরপুরুষ দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—উভয়েরই "দুরারোহিণী আশালতা" মহামহীরুহ অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বীরমন্ত্রের যে মোহ, তাহা দেস্‌দিমোনায় যাদৃশ পরিস্ফুট, শকুন্তলায় তাদৃশ নহে। ওথেলো কৃষ্ণকায়, সুতরাং সুপুরুষ বলিয়া ইতালীয় বালার কাছে বিচার্য্য নহে, কিন্তু রূপের মোহ হইতে বীর্য্যের মোহ নারীহৃদয়ের উপর প্রগাঢ়তর। যে মহাকবি, পঞ্চপতিকা দ্রৌপদীকে অর্জ্জুনে অধিকতম অনুরক্তা করিয়া, তাঁহার সশরীরে সর্গারোহণ পথ-রোধ করিয়াছিলেন তিনি এ তত্ত্ব জানিতেন, এবং যিনি দেস্‌-দিমোনার সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি ইহার গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

তুলনীয়া, কেননা দুই নায়িকারই "দুরারোহিণী আশালতা" পরিশেষে ভগ্না হইয়াছিল—উভয়েই স্বামীকর্ত্তৃক বিসর্জ্জিতা হইয়াছিলেন। সংসার অনাদর, অত্যাচার পরিপূর্ণ। কিন্তু ইহাই অনেক সময়ে ঘটে যে, সংসারে যে আদরের যোগ্য, সেই বিশেষ প্রকারে অনাদর অত্যাচারে প্রপীড়িতা হয়। ইহা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অশুভ নহে, কেন না মনুষ্যপ্রকৃতিতে যে সকল উচ্চাশয় মনোবৃত্তি আছে, এই সকল অবস্থাতেই তাহা সম্যক্ প্রকারে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহা মনুষ্যলোকে সুশিক্ষার বীজ—কাব্যের প্রধান উপকরণ। দেসদিমোনার অদৃষ্টদোষে বা গুণে সে সকল মনোবৃত্তি স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার অবস্থা তাহার ঘটিয়াছিল। শকুন্তলারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব দুইটি চরিত্র যে পরস্পর তুলনীয়া হইবে, ইহার সকল আয়োজন আছে।

এবং দুইজনে তুলনীয়া, কেন না উভয়েই পরম স্নেহশালিনী—উভয়েই সতী। স্নেহশালিনী, এবং সতী ত যে সে।

আজ কাল রাম, শ্যাম, নিধু বিধু, যাদু, মাধু যে সকল নাটক উপন্যাস নবন্যাস প্রেতন্যাস লিখিতেছেন, তাহার নায়িকামাত্রেই স্নেহশালিনী সতী। কিন্তু এই সকল সতীদিগের কাছে একটা পোষা বিড়াল আসিলে, তাঁহারা স্বামীকে ভুলিয়া যান, আর পতিচিন্তামগ্না শকুন্তলা দুর্ব্বাসার ভয়ঙ্কর "অয়মহং ভোঃ" শুনিতে পান নাই। সকলেই সতী, কিন্তু জগৎসংসারে অসতী নাই বলিয়া, স্ত্রীলোকে অসতী হইতেই পারে না বলিয়া দেসদি-মোনার যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার মর্ম্মের ভিতর কে প্রবেশ করিবে? যদি স্বামীর প্রতি অবিচলিত ভক্তি; প্রহারে, অত্যা-চারে, বিসর্জ্জনে, কলঙ্কেও যে ভক্তি অবিচলিত, তাহাই যদি সতীত্ব হয়, তবে শকুন্তলা অপেক্ষা দেসদিমোনা গরীয়সী। স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে শকুন্তলা দলিতফণা সর্পের ন্যায় মস্তক উন্নত করিয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। যখন রাজা শকুন্তলাকে অশিক্ষা সত্বেও চাতুর্য্যপটু বলিয়া উপহাস করিলেন, তখন শকুন্তলা ক্রোধে, দম্ভে, পূর্ব্বের বিনীত, লজ্জিত, দুঃখিত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, "অনার্য্য, আপনার হৃদয়ের ভাবে সকলকে দেখ?" যখন তদুত্তরে রাজা, রাজার মত, বলিলেন, "ভদ্রে! দুষ্মন্তের চরিত্র সবাই জানে," তখন শকুন্তলা ঘোর ব্যঙ্গে বলিলেন,

তুহ্মে জ্জেব পমাণং জাণধ ধম্মথিদিঞ্চ লোঅস্স।
লজ্জাবিণিজ্জিদাওঁ জাণন্তি ণ কিম্পি মহিলাও॥

এ রাগ, এ অভিমান, এ ব্যঙ্গ দেসদিমোনায় নাই। যখন ওথেলো দেসদিমোনাকে সর্ব্বসমক্ষে প্রহার করিয়া দূরীকৃত করিলেন, তখন দেসদিমোনা কেবল বলিলেন, "আমি দাঁড়াইয়া আপনাকে আর বিরক্ত করিব না।" বলিয়া যাইতেছিলেন, আবার ডাকিতেই "প্রভু!" বলিয়া নিকটে আসিলেন। যখন

ওথেলো অকৃতাপরাধে তাঁহাকে কুলটা বলিয়া অপমানের একশেষ করিয়াছিলেন, তখনও দেসদিমোনা "আমি নিরপরাধিনী, ঈশ্বর জানেন।" ঈদৃশ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই বলেন নাই। তাহার পরেও, পতিস্নেহে বঞ্চিত হইয়া, পৃথিবী শূন্য দেখিয়া, ইয়াগোকে ডাকিয়া বলিয়াছেন,

Alas, Iago!
What shall I do to win my lord again?
Good friend, go to him; for, by this light of heaven
I know not how I lost him; here I kneel;

ইত্যাদি। যখন ওথেলো ভীষণ রাক্ষসের ন্যায় নিশীথশয্যাশায়িনী সুপ্তা সুন্দরীর সম্মুখে, "বধ করিব!" বলিয়া দাঁড়াইলেন, তখনও রাগ নাই—অভিমান নাই—অবিনয় বা অস্নেহ নাই—দেসদিমোনা কেবল বলিলেন, "তবে, ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন্!" যখন দেসদিমোনা, মরণ ভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, এক দিনের জন্য, এক রাত্রির জন্য, এক মুহূর্ত্ত জন্য জীবন ভিক্ষা চাহিলেন, মূঢ় তাহাও শুনিল না, তখনও রাগ নাই, অভিমান নাই, অবিনয় নাই, অস্নেহ নাই। মৃত্যুকালেও, যখন ইমিলিয়া আসিয়া তাঁহাকে মুমূর্ষু দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার্য্য কে করিল?" তখনও দেসদিমোনা বলিলেন, "কেহ না, আমি নিজে। চলিলাম! আমার প্রভুকে আমার প্রণাম জানাইও। আমি চলিলাম!" তখনও দেসদিমোনা লোকের কাছে প্রকাশ করিল না যে, আমার স্বামী আমাকে বিনাপরাধে বধ করিয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম যে শকুন্তলা দেসদিমোনার সঙ্গে তুলনীয়া এবং তুলনীয়াও নহে। তুলনীয়া নহে, কেন না ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বস্তুতে তুলনা হয় না। সেক্ষপীয়রের এই নাটক

সাগরবৎ, কালিদাসের নাটক নন্দনকানন তুল্য। কাননে সাগরে তুলনা হয় না। যাহা সুন্দর, যাহা সুদৃশ্য, যাহা সুগন্ধ, যাহা সুরব, যাহা মনোহর, যাহা সুখকর, তাহাই এই নন্দন কাননে অপর্য্যাপ্ত, স্তূপাকৃত, রাশি রাশি, অপরিমেয়। আর যাহা গভীর, দুস্তর, চঞ্চল, ভীমনাদী, তাহাই এই সাগরে। সাগরবৎ সেক্ষপীয়রের এই অনুপম নাটক, হৃদয়োদ্ধূত বিলোল তরঙ্গ-মালায় সংক্ষুব্ধ; দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষ্যাদি ব্যাত্যায় সন্তাড়িত; ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল ঊর্ম্মিলীলা,—আবার ইহার মধুরনীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীতি—সাহিত্যসংসারে দুর্লভ।

তাই বলি, দেসদিমোনা শকুন্তলার তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয়ে ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। তাঁহারা বলেন যে, এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্য কাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে। নাটক নহে বলিয়া যে এ সকলকে নিকৃষ্ট কাব্য বলা যাইবে এমত নহে—তন্মধ্যে অনেকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য, যথা গেটে প্রণীত ফষ্ট এবং বাইরণ প্রণীত মানফ্রেড—কিন্তু উৎকৃষ্ট হউক নিকৃষ্ট হউক—ঐ সকল কাব্য, নাটক নহে। সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে। নাটক নহে বলিলে এতদুভয়ের নিন্দা হইল না, কেন না এরূপ উপাখ্যান

কাব্য পৃথিবীতে অতি বিরল—অমূল্য। [illegible]

ভারতবর্ষে উভয়কেই নাটক বলিতে পারি, কেন না ভারতীয় আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ তাহা সকলই এই দুই কাব্যে আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে দেসদিমোনা চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেসদিমোনা জীবন্ত, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য। দেসদিমোনার বাক্যেই তাহার কাতর, বিকৃত কণ্ঠস্বর আমরা শুনিতে পাই, চক্ষের জল ফোঁটা ফোঁটা গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতেছে দেখিতে পাই—ভূলগ্নজানু সুন্দরীর স্পন্দিততার লোচনের ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আমাদিগের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে। শকুন্তলার আলোহিত চক্ষুরাদি আমরা দুষ্মন্তের মুখে না শুনিলে বুঝিতে পারি না—যথা

ন তির্য্যগবলোকিতং, ভবতি চক্ষু রালোহিতং,
বচোপি পরুষাক্ষরং নচ পদেষু সংগচ্ছতে।
হিমার্ত্তইব বেপতে সকল ইব বিম্বাধরঃ
প্রকামবিনতে ভ্রুবৌ যুগপদেব ভেদংগতে।

শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেসদিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র; দেসদিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেসদিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত; শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।

সুতরাং দেসদিমোনার আলেখ্য অধিকতর প্রোজ্জ্বল বলিয়া

[illegible]
ভিতরে দুই এক। শকুন্তলা অর্দ্ধেক মিরন্দা, অর্দ্ধেক দেসদি-মোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেসদিমোনার অনুরূপিণী—অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।